দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

৬১ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ।। ৬ বৈশাখ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২০ এপ্রিল, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

নির্বাচনে হিন্দুদেরও হিম্মৎ দেখানো দরকার

– সরকার্যবাহ যোশী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বরুণ গান্ধী যা বলেছেন তা গুরুত্ব দিয়ে সবার ভাবা দরকার। এটা ঠিক, এ ধরনের বিষয়ে যথাযথ ভাষা ব্যবহার করা খুব জরুরি। কিন্তু তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে কোনও ভুল ছিল না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশরাও যোশী। যিনি ভাইয়াজী হিসেবেই সুপরিচিত। তিনি আরও বলেছেন, সঙ্ঘ হিন্দু বা হিন্দুত্ব নিয়ে রাজনীতি করতে চায় না। হিন্দুত্ব

(এরপর ১৫ পাতায়)

কেন্দ্র সরকারের নির্দেশেই

টাইটলার-দের ক্লিন চিট দিল সি বি আই

গূঢ়পুরুষ ।। দিল্লীতে ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর দুর্ভাগ্যজনক শিখ নিধন দাঙ্গায় দুই প্রধান অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটলার ও সজ্জন কুমারকে নির্দোষ ঘোষণা করে সি বি আই আদালতে "ক্লিন চিট" দেওয়ার প্রতিবাদে দৈনিক জাগরণের সাংবাদিক জার্নেল সিং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে লক্ষ্য করে জুতা ছোঁড়ে। সংবাদ মাধ্যমের সৌজন্যে এই বিষয়টি সকলেরই জানা। সংবাদ মাধ্যম যে কথাটি জানায়নি তা হ'ল, সি বি আই তথ্য প্রমাণের অভাবে দাঙ্গার দুই নাটের গুরুকে 'ক্লিন চিট' কেন দিলো। জগদীশ টাইটলার ও তার সাগরেদ সজ্জন কুমার কী সত্যিই নিরপরাধ? দেশের কোনও একটি সংবাদপত্রে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়নি। বরং বিতর্ক হয়েছে সাংবাদিক জার্নেল সিংয়ের জুতা ছোঁড়াটা উচিত অথবা অনুচিত কাজ নিয়ে। ইরাকের বাগদাদে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে লক্ষ্য করে সাংবাদিকের জুতা ছোঁড়ার পর এই জাতীয় রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। তখন বামপন্থীরা সেই ঘটনাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবাদ বলে উল্লসিত হয়েছিল। দিল্লীর ঘটনায় বামপন্থীরা বিপাকে পড়েছে। সমর্থন করলে সেই জুতা যে কোনও সময়ে তাদের মাথায় পড়তে পারে। নিন্দা করলে শিখ ভোট হারাতে হবে। অর্থাৎ ভারতীয় কম্যুনিস্টদের এখন উভয় সঙ্কট। জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। তারা এখন শ্যাম রাখে না কুল রাখে তাই স্থির করতে পারছে না।

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর দিল্লীতে ৩১ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর টানা দুই দিন ধরে কংগ্রেসী গুণ্ডা সমাজবিরোধীরা শিখ নারী, পুরুষ, শিশুদের উপর হামলা চালায়। শিখদের দোকান, হোটেল লুঠ করে জ্বালিয়ে দেয়। দেশের রাজধানীতে এমন অরাজকতা বন্ধ করতে সেদিন দিল্লীর প্রশাসন ও পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ অথবা নরসীমা রাওরা কেউই অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

সজ্জন কুমার

জগদীশ টাইটলার

বিজেপি-র নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বন্ধ পুলিশ ফাইল পুনরায় খোলা হয়। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নির্দেশে শিখ নিধন দাঙ্গার চক্রান্তকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার জন্য এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। বিচারপতি নানাবতীর নেতৃত্বে গঠিত এই নানাবতী তদন্ত কমিশন দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ২০০৫ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের হাতে তদন্ত রিপোর্টটি তুলে দেয়। অনেক টালবাহানার পর বিরোধী এন ডি এ সাংসদদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মনমোহন সিংহ সরকার ২০০৫ সালের ৮ আগস্ট সংসদের উভয় কক্ষেই নানাবতী কমিশনের রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য হয়। একই সঙ্গে বলতে হয় রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে।

নানাবতী কমিশন যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেছে সে ব্যাপারে সংসদের উভয় কক্ষেই সর্বসম্মতভাবে ডান বাম সব দলেরই সাংসদরা একমত ছিলেন। পক্ষপাতিত্বের কোনও অভিযোগ উঠেনি। তাই নানাবতী কমিশনের রিপোর্টে দেওয়া তথ্য নির্ভরযোগ্য ধরে নেওয়া যায়। এই কমিশন স্পষ্টভাবে বলেছে যে কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটলার "খুব সম্ভবত" (Very Probably) শিখ নিধন দাঙ্গায় প্ররোচনা দিয়েছিল। এই বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত তদন্ত করে টাইটলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ। জগদীশের সাগরেদ সজ্জন কুমার সম্পর্কে কমিশন বলে, এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সব প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থানায় অভিযোগ জানিয়ে ছিল সেই অভিযোগগুলি নিয়ে পুনরায় তদন্ত হওয়া দরকার। কারণ, সজ্জন কুমারের বিরুদ্ধে লায়ের করা "এফ আই আর" গুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। থানায় নথিপত্র এভাবে নষ্ট করা যায় না।

(এরপর ১৫ পাতায়)

অপদার্থতা ঢাকতেই গোর্খাল্যাণ্ড নিয়ে বঙ্গভঙ্গ-র ধুয়ো তুলেছে সি পি এম

অর্থব নাগ ।। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং অবশেষে ঘোষণা করলেন যে এই পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে তাঁদের সমর্থন থাকবে বিজেপির দিকেই। উত্তরের দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র তো বটেই, সেই সঙ্গে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতেও বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন করবেন তাঁরা। গুরুং-এর এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই বিজেপির পক্ষ থেকে দার্জিলিং কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয় প্রাক্তন সেনা অফিসার ও একদা কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী যশোবন্ত সিংহকে। মনোনয়নপত্র পেশ করার পর গত ১০ এপ্রিল সুখিয়াপোখরিতে জনসভা থেকে ভোটের প্রচার শুরু করে দিলেন যশোবন্ত। এরপরের জনসভা করার কথা দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং-এ। দাবি আর প্রত্যাশা পূরণের স্বপ্নে বিভোর পাহাড়বাসীর সর্বসম্মত সমর্থন তাঁরই দিকে। সেই সাথে সমতলবাসীরও পর্যাপ্ত সমর্থন তুলে জয় নিশ্চিতই করে ফেলেছেন যশোবন্ত। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও বিজেপির এই নয়া সমীকরণ রাজ্য রাজনীতির মোড় অকস্মাৎ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ কয়েকদিন কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক টালবাহানার পর গুরুং-এর এই ঘোষণা আপতত শান্তি এনেছে পাহাড়ে। মাস দেড়েক পূর্বে লালকৃষ্ণ আদবানীর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর বাসভবনে নৈশভোজে অংশ নেন গোর্খা নেতৃত্ব। তখন থেকেই শুরু হয় সমঝোতার সেতুবন্ধন। তা এখন পরিপূর্ণ রূপ নেওয়ার পরে পাহাড়ের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই জাতীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তেই আবর্তিত হচ্ছে।

পাহাড়ে সমর্থকদের সঙ্গে যশবন্ত সিংহ।

কি চান এই বিমল গুরুংরা? গোর্খাল্যান্ড নিয়ে পাহাড়ের মানুষের দাবি অনেকদিনের। গোর্খারা বরাবরই চাইতেন পার্বত্য এলাকা দার্জিলিং, ডুয়ার্সের বাগান এলাকা এবং সংলগ্ন তরাই অঞ্চল নিয়ে গঠন করা হোক পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য। এই চাওয়ার পেছনে একদিকে যেমন রয়েছে স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন তেমনি রয়েছে দীর্ঘদিনের অবহেলা করার অভিযোগ সেই কংগ্রেসী আমল থেকেই। তবে বিগত বাম জমানায় এই ক্ষোভের পারদের মাত্রা ক্রমেই চড়তে থাকে। সিটুর আন্দোলনের জেরে একের পর এক চা-বাগানের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে যায়। কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েন বাগানের অসংখ্য শ্রমিক। প্রথম প্রথম অর্ধাহার আর তারপর অনাহার অপুষ্টিতে ভোগা হাজিসার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্ম দিচ্ছে।

চা-বাগানে চা-পাতা তোলার কাজে একদা নিযুক্ত রমণীরা এখন বাধ্য হচ্ছেন পৃথিবীর আদিমতম পেশাকে বেছে নিতে। একমাত্র পর্যটন শিল্প বাদে আর কোনও বিকল্প কর্মসংস্থান গড়ে তোলার চেষ্টাই

(এরপর ১৫ পাতায়)

বরুণ গান্ধীর জেল হলে সুভাষ ছাড়া পাবেন কেন?

বরুণ গান্ধী-অশোক সাহুদের জন্য এক বিচার, আর সোনিয়া গান্ধী-সুভাষ চক্রবর্তীদের জন্য অন্য?

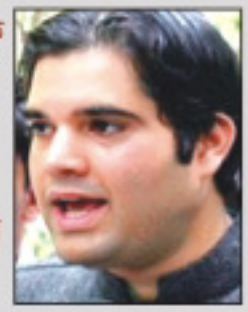

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। হিন্দু সমাজকে যে বা যারা আঘাত হানবে প্রয়োজনে তার হাত কেটে দেবে বলে বেজায় দোষ করেছেন বরুণ গান্ধী। তাঁর স্থান এখন উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া জেলে। মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী বরুণের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছেন। যারা অর্থ বিনা জামিনে বরুণ গান্ধীকে এক বছর পর্যন্ত জেলের ঘানি টানতে হতে পারে। মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক তোষণকারী রাজনেতারা একযোগে গেল গেল করে উঠেছে। কেন বরুণ গান্ধী হিন্দুদের বিশেষ করে গিলগিটে আক্রান্ত হিন্দুদের হয়ে কথা বলেছেন।

প্রশ্ন উঠেছে, যদি বরুণ গান্ধীকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে জেলে পোরা হয় তাহলে সোনিয়া গান্ধী, সুভাষ চক্রবর্তীরা জেলের বাইরে কেন? গত গুজরাত বিধানসভা ভোটে সোনিয়া গান্ধী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'মৃত্যুর সওদাগর' বলে মন্তব্য করেছিলেন। কোনও রাজ্যের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে মৃত্যুর সওদাগর বলা কি ঘৃণার রাজনীতি ছড়ানো নয়? বিদ্বেষ তৈরি করা নয়? তাহলে তো সোনিয়া মাইনো গান্ধীরও জেলে যাওয়া উচিত। আর সিপিএম নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর বক্তব্য কি বেদের বাণী? সম্প্রতি তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে জনজাতিআন্দোলনের এক নেতা সম্পর্কে বলেছেন, তাঁকে আছড়ে মেরে জেলে পুরে দিতেন। রাজ্যের সাংবিধানিক পদে থাকা এক মন্ত্রী কি করে একথা বলেন? ভারতীয় ফৌজদারি বিধি অনুযায়ী একজন সাধারণ মানুষ অন্য কাউকে এমন হুমকি দিলে তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা হওয়ার কথা। কিন্তু সুভাষ চক্রবর্তীর এই বক্তব্য নিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব কোনও প্ররোচনা দেখেননি। তিনি মনে করেছেন, সুভাষবাবু অন্যায় কিছু বলেননি। সোনিয়া কিংবা সুভাষের ক্ষেত্রে আইনের রক্ষকরা অন্যথা কিছু দেখেন না। কিন্তু সেই কথাই যদি ওড়িশার আক্রান্ত হিন্দুদের কথা বলে অবসরপ্রাপ্ত

(এরপর ১৫ পাতায়)

জয় হনুমানজী ! জয় শ্রীরাম !

বিশাখা বিশ্বাস

অবশেষে সেই সাধু শোধন করিল
মুরগী তুলসীপত্র দিয়া / রন্ধন করিল
তারে গঙ্গাবারি দিয়া।। শোধিত মুরগী
ভক্ষণ শেষে কহে সাধু সেই উপাখ্যান
— সেকুলার-কম্যুনিস্ট কথা অমৃত
সমান / বঙ্গজন সবে করে অবধান।....

রাজনীতিতে যারা স্থান নেননি, ভক্তিলোকে স্বধর্মে যারা স্থানহারা হননি, তাদেরই একজন জননী কমলা বসু। ভক্তি ও বিশ্বাসের দীপ্যমান শিখাটি হাতে নিয়ে 'বাবা' তারকেশ্বরের প্রসাদী বিল্বপত্রটি সেই যে সেদিন তিনি চেয়ে আনলেন, সেই বিল্বপত্র কপালে ঠেকিয়েই সাতগাছিয়ায় প্রথম নির্বাচনী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছিলেন 'ভূত-ভগবান-ভবিষ্যতে' (জ্যোতিষে) অবিশ্বাসী কমরেড জ্যোতি বসু। এরই নাম ঠেলা। ঠেলায় পড়লে ভুতে অবিশ্বাসী কমরেডরাও বলে "ঠিক দুপুর বেলা / ভূতে মারে ঢেলা।"

আসলে যাবতীয় অতিপ্রাকৃত সত্ত্বাকে অস্বীকার করেই সেকুলারবাদ তার অবয়ব গ্রহণ করে। আমাদের দেশের সিউডো সেকুলার সাম্যবাদীদের কাছে সেকুলারবাদের অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে বিশেষ সম্প্রদায়কে বিশেষ বিশেষ ভাবে তুষ্টিকরণ। কিন্তু ঠেলার নাম বাবাজী, ঠেলায় পড়লে বেয়াইও হন গুরুজী। অতএব, সতীর পুষ্পে পতির ফসল ফলে সাতগাছিয়ায়, একবার নয় বারবার, তারকেশ্বরের বেলপাতায় নির্বাচনী-দরিয়া পার — ভোলেবাবা পার করে গা.....

গুরুর পরে আরেক 'চ্যালা' — তাকেও ভূতে মারে ঢ্যালা। তাই সেই ইডেনে সমাজবিরোধীদের আখড়া কেলেঙ্কারীতে 'চ্যালা' সুভাষ চক্রবর্তী পার্টিতে যখন কোণঠাসা, তার 'ভগবান' (কমরেড জ্যোতি বসু নন) বামদেবের পাদপদ্মে ফুলপাতা দিয়ে প্রণাম সেরে জবার মালা তাকে পরাতে হয় সেই ব্রহ্মময়ী (তারা) মায়ের গলায় (বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথায়) !....

আসলে, মহাপ্রভু 'কন্ডুক্লেদ গায়' অস্পৃশ্যকে যে আলিঙ্গন করেছিলেন তা ইতিহাস অনুশীলন করে নয়, চলতি ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে। প্রকৃতপক্ষে বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্তির তরেই মার্ক্সবাদী, নাস্তিকদের এই দলীয় মন্ত্রীটি সেদিন যে 'বিপদত্তারিণী মা'-এর পায়ে জবা দিয়ে এলেন, তা বিশুদ্ধ মার্ক্সবাদের নীতিকে মান্যতা দিয়ে নয়, সেই নীতি-রীতিকে উপেক্ষা করে। অথচ, তারপরেই উল্টা সুর ঃ পান্ডারা আমার হাতে মালাটা দিল, তা কি আমি ফেলে দেবো ? — স্বনিষ্ঠ বিশ্বাস আর প্রকাশ্য ছলনা, এরই নাম মার্ক্সবাদী ভন্ডামী। গোস্পদে বিশ্বাকাশ দৃশ্য হয়,

> **নাস্তিকদের এই দলীয় মন্ত্রীটি সেদিন যে 'বিপদত্তারিণী মা'-এর পায়ে জবা দিয়ে এলেন, তা বিশুদ্ধ মার্ক্সবাদের নীতিকে মান্যতা দিয়ে নয়, সেই নীতি-রীতিকে উপেক্ষা করে। অথচ, তারপরেই উল্টা সুর ঃ পান্ডারা আমার হাতে মালাটা দিল, তা কি আমি ফেলে দেবো ? — স্বনিষ্ঠ বিশ্বাস আর প্রকাশ্য ছলনা, এরই নাম মার্ক্সবাদী ভন্ডামী।**

ছোট্ট ছোট্ট ঘটনায় কমিউনিস্টদের এই ভন্ডামী জনারণ্যে প্রকাশ পায়। মার্ক্সবাদীদের পিতৃভূমি রাশিয়ায় (এবং চীনেও) কম্যুনিস্ট রীতিতে 'লচিং' হয় মদের বোতল ভেঙে। সুন্দরবনে নারকেল ভেঙে প্রদীপ জ্বেলে, শঙ্খ বাজিয়ে সমুদ্রে জাহাজ ভাসালেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (কেননা তখন বিজেপি-শাসনকালে, দিল্লী গিয়ে তাকে সর্বাগ্রে যেতে হতো আদবানীর আস্তানায়, হায়)! খোদ যোশীজী থেকে আদবানী সেদিন তার পিঠ চাপড়ালেন। জমানার বদল হল। এলো সিপিএম-এর পালায় দাঁড়ানো ইউ পি এ সরকার। ভট্চাজ সাহেবের মাতৃ বিয়োগ হল। সাহেব ধুতি ছেড়ে প্যান্ট পরে মাথা না কামিয়েই বিদেশে গেলেন (কমিউনিস্টরা মাতৃ বিয়োগে মাথা কামায় নাকি!) এদের এই ভন্ডামীর তারই বাঁধা আছে সব নেতা থেকে আধা নেতার গলায় — এদের একতারাতে বাঁধা আছে দো-তারার সুর, একই তারে নাচে মহাকালী, নাচে মার্ক্স, নাচেরে কভুর (কভুর হলেন সেই ডক্টরেট যার রচনায় যাবতীয় হিন্দুসংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রতি তথাকথিত যুক্তিবাদী ঘৃণা সুদূর কামরূপ থেকে কচ্ছে দিয়েছে হানা)। এদের গরীব-প্রেমের ইতিহাস বন্যার টাকা থেকে এক'শ দিনের কাজের টাকা-র অপহরণে আস্তানা গেড়েছে, এদের নিপীড়িত মানুষের সেবার ইতিবৃত্ত মরিচঝাঁপি থেকে লালগড়ে আশ্রয় নিয়েছে, এদের তুষ্টিকরণের ইতিকথা পাকিস্তান পয়দার দাবি থেকে বাবরি মসজিদ পর্যন্ত প্রসারণপ্রাপ্ত হয়েছে, এদের রাজনৈতিক ভন্ডামী সেই 'স্বৈরাচার ও আধা ফ্যাসীবাদ' থেকে সম্প্রতি 'সাম্প্রদায়িকতায়' প্রবেশ করেছে। সর্বত্র এরা এদের 'ভন্ডামীকে' তত্ত্বের বাক্জাল দিয়ে ঘিরে রাখে, 'পরিবর্তিত পরিস্থিতির' তুলসীপাতা দিয়ে সর্বদাই সেই সব ভন্ডামীকে এরা শুদ্ধ করে নেয়, গঙ্গাজলের যুক্তি তর্ক দিয়ে সেই ভন্ডামীকেই উপজীব্য করে এরা বেঁচে থাকে, মানুষকে প্রতারণা করে এরা টিকে থাকার রসদ সংগ্রহ করে।....

ভন্ডামীর ইতিহাসে এদের ছলনার নতুন অধ্যায় সম্প্রতি সংযোজন করেছেন এদের উর্দুভাষী, তসলিমা-বিতাড়নের এক নায়ক, বাংলার বুদ্ধের কাছের এক যুব নেতা — পবিত্র ইসলামের পৌত্তলিকতাবাদের নীতি ভঙ্গ করেও, সম্প্রতি তিনি ভোটের মুখে কোনও এক হনুমান মন্দিরের আশীর্বাদ চানজল সেবন করেছেন। মেরা ভারত মহান / সাঁরে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থাঁ হামারা / এত ভঙ্গ বঙ্গ রাজনীতি তবু কত রঙ্গভরা)। শ্রী ও শ্রীমান 'ভন্ড'গণের জয় হোক — জয় হনুমানজী, জয় শ্রীরাম! ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ!!....

হিন্দু ভোট এককাট্টা করতে হিন্দু মঞ্চর ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বারোটি সংগঠনের সম্মিলিত মোর্চা হিন্দু রক্ষা মঞ্চ হিমাচল প্রদেশে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হিন্দু ভোট এককাট্টা করতে ময়দানে নেমে পড়েছে। এই অরাজনৈতিক মঞ্চ টির মূল উদ্দেশ্য হল তথাকথিত ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও হিন্দুত্ব বিরোধীদের ভারতমাতার নামে ভারত বিরোধী শক্তিকে রুখে দেওয়া। একই সঙ্গে হিন্দু ভোট যেন ভাগ না হয়— তা সুনিশ্চিত করা। হিন্দু সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে — বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সনাতন ধর্মসভা, গায়ত্রী পরিবার, বাল্মীকি ধর্ম সমাজ, রবিদাস সমাজ। এছাড়াও রুদ্রবাবা সভা এবং সিং সভা সকলেই এক মঞ্চে একত্রিত হয়েছেন। মঞ্চের বরিষ্ঠ আহ্বায়ক রমেশ সূদ বলেছেন, "তাঁরা কোনও ধর্মের বিরোধী নন। কিন্তু তাঁরা ছদ্ম-সেকুলারবাদের বিরোধী, কেননা ওরা হিন্দুদেরকে কোণঠাসা করে সংখ্যালঘুদের তোষণ করে।"

মঞ্চ ইতিমধ্যে গত ১২ এপ্রিল এক ধর্মযজ্ঞ এবং রাষ্ট্রজাগরণ সঙ্কল্প সভার আয়োজন করেছিল। ওই দিন থেকেই রাজ্যব্যাপী প্রচার অভিযানও আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রচারে হিন্দুদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ হলেও তাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সহ-সভাপতি কপিল দেব সূদ বলেছেন, তাঁদের মঞ্চ রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরেও প্রচারে হিন্দুসমাজ এবং হিন্দুধর্মকে সুরক্ষিত রাখার কথা বলবে। যে দল বা ব্যক্তি একাজ করবে তাদেরকেই যেন হিন্দুরা ভোট দেন। শ্রীসূদ বিজেপি নেতা বরুণ গান্ধীকে সমর্থন করে বলেন, বরুণ রাষ্ট্রস্বার্থ বিরোধীদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে কোনও অন্যায় কাজ করেননি। আমরা সেই সব দলের বিরুদ্ধে যারা সেকুলারিজমের নামে হিন্দু বিরোধিতা করছে। তবে নেতারা সবাই তাদের মঞ্চ কে অরাজনৈতিক বলে দাবি করেন।

এই সময়

ভুল শুধু ভুল

গত ২০০৪ সালে বামপন্থীদের সমর্থনে সরকার গড়ার পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বিবৃতি দিয়েছিলেন — কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমী। সম্প্রতি কেরলের কোচিতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে এসে তিনি বলেছেন, কমিউনিস্টরা বরাবরই ভুল পথে হেঁটেছে। ওদের ইতিহাস ভুলে ভরা। প্রধানমন্ত্রী এই ভুল কবে বুঝতে পারলেন ? ২০০৪ সালেই কী বুঝেছিলেন নাকি ২০০৮ সালে এঁরা সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিল বলে ? সাংবাদিকদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে মনমোহন সিং অবশ্য চুপই ছিলেন।

অপরাধের রাজনীতি

অপরাধী মুক্ত রাজনীতির কথা যতই উঠে আসুক না কেন, বাস্তবে ঠিক উল্টো পথে চলছে বিহার। সম্প্রতি বিহারে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া প্রার্থীদের পরিচয়পত্র নিরীক্ষণ করে জানতে পারা গেছে শতকরা ২৫ ভাগ প্রার্থীই অপরাধী। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে কোনও না কোনও অপরাধের মামলা ঝুলছে, এই অপরাধের মধ্যে সবাচাইতে বেশি রয়েছে লালুপ্রসাদের পার্টি আর জে ডি। আর ঠিক তার পরেই রামবিলাস পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি, বি এস পি ইত্যাদি।

উল্টো চিত্র

আর্থিক সঙ্গতির বিচারে ওড়িশা দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির থেকে পিছিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যায় কিন্তু ওড়িশা পিছিয়ে নেই। সরকারি সূত্র মতে দেশের অগ্রগণ্য রাজ্যগুলির প্রার্থীদের চাইতে ওড়িশায় কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যাটা অনেক বেশি। ২৭ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্রে আর্থিক সঙ্গতির কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, তারা কোটিপতি। যেখানে অন্য রাজ্যগুলিতে তা মেরেকেটে ১৫ বা ২০ জন হবেন।

ভাষা ইস্তাহার

তিনি ইংরেজীর বিরোধী নন, কিন্তু তবুও ক্ষমতায় আসলে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল তুলে দেবেন। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদব। তাঁর স্পষ্ট মত, দেশের অধিকংশ মানুষই স্বাভাবিক, জীবনযাত্রায় হিন্দি ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইংরেজির বাতাবরণ তৈরি করে ইংরেজি ভাষা আরোপ করা এক গভীর চক্রান্ত। এই প্রবণতা মাতৃভাষার প্রতি বিজাতীয় আক্রমণ বলে শ্রী সিং মন্তব্য করেন।

মাদ্রাসার বিপদ

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে গজিয়ে ওঠা কওমি মাদ্রাসাগুলি যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে তা স্পষ্ট ভাষায় জানালেন বাংলাদেশ সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে জেলা সুপারদের এক বার্তায় জানানো হয়েছে যে কোরাণের উপর ভিত্তি করে কওমি মাদ্রাসাগুলি ব্যাপকহারে হিংসা ছড়াচ্ছে। এমনকী বিদেশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র অর্থ আমদানি করে রীতিমতো অভ্যন্তরীণ সঙ্কট তৈরি করেছে, প্রসঙ্গত কওমি মাদ্রাসাগুলির কর্মকান্ড নিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দারাও ভারত সরকারকে বহুবার রিপোর্ট দেওয়া সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

ভোটের হারের ফারাক

কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সারা ভারতে প্রাপ্ত ভোটের হারের পার্থক্য ১৯৯৯-এ ৪.৮৩ শতাংশ থেকে কমে ২০০৪-এ ৪.৫৩-তে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ নামে মাত্র ফারাক। অথচ আসন সংখ্যার বিচার কংগ্রেস ১১৪ থেকে ১৪৫-তে পৌঁছে গিয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৯৯-এর তুলনায় ২০০৪-এ ৩১টি আসন বেশি পেয়েছিল। অন্যদিকে আসন বাড়া তো দূরের কথা, বরং বিজেপির আসন সংখ্যা ১৮২ থেকে কমে ১৩৮-তে পৌঁছেছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পিএ-র তখন আসন সংখ্যা ছিল ২১৭ এবং এন ডি এ-র ১৮৫। বামদের ৬১ জন সাংসদের সমর্থনে ইউপিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়েছিল।

ক্ষুব্ধ বর্ধন

প্রচার মাধ্যমের উপর বেজায় চটেছেন সি পি আই জেনারেল সেক্রেটারি এ বি বর্ধন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে বামফ্রন্টের অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে জ্যোতি বসুকে প্রাধান্য দেওয়ায় বা তুলে ধরায় তিনি প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বর্ধনের বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কীভাবে এই নির্বাচনে লড়াই হবে এবং দলকে কীভাবে কারা নেতৃত্ব দেবেন সে ব্যাপারে জ্যোতি বসুর মন্তব্যই শিরোধার্য — এমন একটা আবহাওয়া প্রচার মাধ্যম তৈরি করতে চাইছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সিপিএমের যদি কোনও দায়বদ্ধতা থাকে তা তাদের ব্যাপার। কিন্তু ফ্রন্টের অন্যরা বসুর কথার বা উপদেশ মেনে নেবেন এমন কোনও দায়বদ্ধতা নেই বলে জানান সিপিআই নেতা এ বি বর্ধন।

বংশানুক্রমিক রাজনীতি

বংশানুক্রমিক রাজনীতিতে আসার চিত্র এবার ওড়িশার রাজনীতিতে সর্বাধিক। আটজন প্রাক্তন নেতার পুত্র এবার পারিবারিক সূত্র ধরে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। ওড়িশার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘড়াই এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গিরিধর গোমাঙ্গ-এর পুত্র প্রীতিরঞ্জন গড়াই ও শিশির গোমাঙ্গ এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। একই ভাবে বিজেডির প্রাক্তন সভাপতি অশোক দাসের পুত্র প্রণব প্রকাশ দাস, বিভূতি ভূষণ সিং-এর পুত্র সিদ্ধার্থ সিং, চৈতন্য প্রসাদ মাজির কন্যা সরোজিনি মাজি, এ ইউ সিংদেও'র বৌমা প্রকৃতিদেবী সিংদেও, জয়রাম পাঙ্গির ভাইপো প্রফুল্ল পাঙ্গি, নীলাদ্রি নায়েকের ভাইপো প্রেমানন্দ নায়েক এবং বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী জগন্নাথ মালিকের পুত্র মানস মালিক এবারে নির্বাচনী প্রার্থী।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজধানীর নির্বাচনী রণাঙ্গন

সি বি আই ক্লিন চিট দেওয়া সত্ত্বেও দলনেত্রী ও বর্তমান বিখণ্ডিত ইউপিএ জোটের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর শুভবুদ্ধি র উদয় হইয়াছে। তিনি উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ দিল্লীর বর্তমান সাংসদ জগদীশ টাইটলার এবং সজ্জন কুমার-এর প্রার্থীপদ বাতিল করিয়াছেন। ইহাতে নিঃসন্দেহে তিনি সাধুবাদের যোগ্য। ১৯৮৪ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হইবার অব্যবহিত পরে রাজধানী দিল্লী নিবাসী নিরপরাধ শিখ সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার অবাল-বৃদ্ধ -বণিতা কংগ্রেস কর্মীদের হাতে নির্বিচারে কচুকাটা হইয়াছিলেন। সেই নিধনযজ্ঞে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন গান্ধী পরিবারের পদলেহী জগদীশ ও সজ্জন কুমার — এই অভিযোগ দীর্ঘদিন হইতেই সংবাদ মাধ্যমে বহুল চর্চিত এবং আলোচিত।

সোনিয়ার পূর্বসূরী নরসিমা রাও-এর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে সি বি আইকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করিবার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের পুরানো মামলায় হঠাৎ করিয়া নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসীদের ক্লীন চিট আবারও সি বি আইকে বিতর্কের কেন্দ্রে টানিয়া আনিয়াছে। সম্ভবত, দিল্লীর শিখ ভোট কংগ্রেসের বাক্সে টানিয়া আনাই ছিলএই ক্লিন চিট দেওয়ার নেপথ্যের গুঢ়ার্থ। তবে ইহাতে যে হিতে বিপরীত হইয়াছে তাহা সোনিয়াজী শীঘ্রই টের পাইয়াছেন। বিগত দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনে সেখানকার কর্পোরেশনে ক্ষমতাসীন বিজেপি কংগ্রেসের হাতে পর্যুদস্ত হইয়াছিল। দিল্লী রাজ্যের ক্ষমতার রাশ বিজেপির কাছে অধরা রহিয়া যায়। সেই হারের বদলা লইবার উপযুক্ত সুযোগ এখন সংসদীয় নির্বাচনে উপস্থিত হইয়াছে। কেননা, সজ্জন-জগদীশের টিকিট কাটিয়া যাওয়াতে যাত্রাভঙ্গ হইয়াছে কংগ্রেসের। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিবার, আরোপ-প্রত্যারোপের পালা ক্রমশ বাড়িতেছে। সজ্জন-জগদীশরা দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতকে তাহাদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য দায়ী করিতেছেন।

এমতাবস্থায়, ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যাকফুট হইতে ফ্রন্টফুটে চলিয়া আসিয়াছে। আবার পাঞ্জাবে বেশি আসন বাগাইবার প্রত্যাশায় পাঞ্জাবী প্রধানমন্ত্রী এ্যাণ্ড কোং যদি ভাবিয়া থাকেন তাহাও অবাস্তব। পাঞ্জাবে এই মুহূর্তে ক্ষমতাসীন আকালি-বিজেপি জোট যে সংসদীয় নির্বাচনে জয়লাভে সর্বাত্মক প্রয়াস করিবে তাহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু টাইটলারদের লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার পক্ষান্তরে তাহারা যে ১৯৮৪-র সেই ভয়াবহ শিখ-নিধন যজ্ঞে জড়িত ছিল তাহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়াই বিরোধী বিজেপি-আকালি দল প্রচার করিতেই পারে। জার্নেল সিং-এর পাদুকা নিক্ষেপেই এই অবস্থা। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে শিখরা সি বি আই তথা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। যে কারণেই সম্ভবত, অন্তরাত্মা অন্তরে ভীতি অনুভব করিয়াছেন। এই সুযোগ ভারতীয় জনতা পার্টি রাজধানী দিল্লীর লোকসভা আসনগুলিতে তাহাদের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী। জগদীশ-সজ্জনরা নিজ প্রভাবে জয়ী হইবার ক্ষমতা রাখিতেন। তাহাদের অবর্তমানে দলীয় কর্মীদের উপর হইতে নীচ পর্যন্ত নিরাশা ও হতাশার চিত্র প্রতিভাত। বিকল্প প্রার্থীর হইয়া সজ্জনদের নির্বাচনী সেট-আপ আগের মতো সক্রিয় যে হইবে না — ইহা ধরিয়া লওয়া ভুল হইবে না। এই ফাঁক পূরণ করিতে শীলা দীক্ষিতকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইতে পারে।

উপরন্তু চাঁদনী চকে কংগ্রেস প্রার্থী কপিল সিবালের জনভিত্তি ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। নতুন দিল্লীতে অজয় মাকেনের সামনে বিজেপি'র বিজয় গোয়েল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। অর্থাৎ রাজধানীর প্রায় সবকটি আসনে বিজেপি শিবিরে উৎসাহের পরিবেশ। ইতিমধ্যে এলাকারও পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে।

খবর হইল, কংগ্রেস একজন বৈশ্য এবং একজন মুসলিম প্রার্থী দাঁড় করাইতে পারে। প্রস্তাবিত নাম — কংগ্রেসী বিধায়ক নরেন্দ্র নাথ কিংবা চৌধুরী মতিন আহমেদ। আবার ভারতীয় রাজনীতির চিরাচরিত প্রথানুসারে সজ্জনকুমার এবং জগদীশ টাইটলারদের পুত্রদ্বয় যথাক্রমে জনপ্রবেশ ও সিদ্ধার্থ নিজ নিজ পিতার কেন্দ্রে প্রার্থী পদের দাবিদার হইতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের প্রচারে আরও সুবিধা হইবে।

আবার আকালি দল শেষ মুহূর্তে সজ্জন-টাইটলারদের টিকিট কাটাকে স্টেজে ম্যানেজ বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। হয়ত জার্নেল সিং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চিদম্বরমের দিকে পাদুকা নিক্ষেপ না করিলে অবস্থা পূর্ববৎ থাকিত। এক সাংবাদিক সম্মেলনে সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং সাধারণ সম্পাদক জনার্দন দ্বিবেদী বলিয়াছেন, 'জগদীশ টাইটলার এবং সজ্জন কুমার দলকে লজ্জাজনক অবস্থায় পড়িতে দিতে চাহেন না। যে যেভাবেই স্টেজ ম্যানেজ করুক না কেন কংগ্রেসকে ব্যাকফুটেই খেলিতে হইতেছে।

২০০৪-এর লোকসভার নির্বাচনে পাঞ্জাবে মোট ১৩টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র দুইটিতে কংগ্রেস দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি এড়াইতে সোনিয়ার নেকতৃত্বাধীন কংগ্রেস তৎপর। তবে ভারতবর্ষে বার বার দেখা গিয়াছে যে, লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে ভোটদানের প্রকৃতি পরস্পর আলাদা থাকে।

মাত্র ক'দিন আগেও কংগ্রেসের সাংগঠনিক অবস্থান রাজধানীর রাজনীতিতে শীলা দীক্ষিত সরকার এর কারণে বেশ ভালোই ছিল। তাহারা অধিকতম সাতটি এবং ন্যূনতম ছয়টি আসন দখলের আশা করিয়াছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল কংগ্রেসের প্রার্থী বদলের রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। আকালি দলের যুব শাখার সভাপতি কিরণবীর সিং প্রার্থী বদলকে এক রাজনৈতিক গিমিক বলিয়াই মন্তব্য করিয়াছেন।

ভুল হিসাব দেখানোয় সত্যমের প্রধান গ্রেপ্তার

ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য সরকারের প্রধানকে নয় কেন ?

এন সি দে

গত সেপ্টেম্বরে লেম্যান ব্রাদার্স মেরিল লিঞ্চ প্রভৃতি মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাঙ্কগুলির পতনের পর থেকে সারা বিশ্বে যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার প্রভাব থেকে কোনও দেশই পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। বিশ্ব পুঁজিবাদের পান্ডা সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মস্তিষ্ক প্রসূত মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়ণের গালভরা তত্ত্বে আকৃষ্ট বা বাধ্য হয়ে, যে সমস্ত দেশ ডব্লু টি ও অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করেছে, তারাই মার্কিন আর্থিক সঙ্কটের ভাগী হয়েছে। মনে রাখতে হবে ডব্লু টি ও-র প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্থাৎ পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলির বাণিজ্য সংগঠন। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে এই বাণিজ্য সংগঠনের অধীনে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই দেশগুলির সম্পদ লুণ্ঠন করা। তাই ডব্লু টি ও'র প্রধান পান্ডা আমেরিকার এই সঙ্কট থেকে যে ভারত বাদ যাবে না অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী ও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর তা জানা উচিৎ ছিল। ভারতের চেয়ে অনেক গুণ বেশি জাতীয়তাবাদী আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতির অধিকারী চীন পর্যন্ত এর প্রভাব অস্বীকার করতে পারেনি। চীন তার শিল্পগুলিকে বাঁচাতে সাত তাড়াতাড়ি কোটি কোটি টাকা আর্থিক অনুদান প্যাকেজ ঘোষণা করে দিয়েছে। ভারতে শেয়ার মার্কেটে ধস নেমেছে, মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে, তবুও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এক নাগাড়ে বলে গেছেন যে, ভারতে আর্থিক সঙ্কটের কোনও প্রভাব পড়বে না। কারণ ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি নাকি অত্যন্ত মজবুত। সদ্য প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম্‌ও তোতাপাখির মতো সেই একই কথা আওড়ে গেছেন।

কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? রপ্তানী নির্ভর শিল্পগুলিতে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই অথবা বেতন ছাঁটাই শুরু হয়ে গেছে। বস্ত্র-শিল্পে নিযুক্ত প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য সর্বকালীন নীচে নেমে গেছে। এক ডলারের দাম ৫২ টাকারও বেশি হয়ে গেছে। অর্থাৎ বিদেশে বেশি টাকার পণ্য পাঠিয়ে কম ডলার আয় হচ্ছে। আবার বিদেশ থেকে জিনিস কিনতেও বেশি টাকা দিতে হচ্ছে। গত জানুয়ারিতে অপরিশোধিত তেল, পেট্রো-শোধনাগারজাত পণ্য, কয়লা, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট ও তৈরি ইস্পাত — এই ছয়টি মূল পরিকাঠামো শিল্পের মিলিত বৃদ্ধি র হার নেমে এসেছে মাত্র ১.৪ শতাংশে। ২০০৮-এর জানুয়ারিতে এর হার ছিল ৩.৬ শতাংশ। বস্তুত দেশের গোটা শিল্প ক্ষেত্রেই মন্দার ছায়া ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। ২০০৮ -এর শেষ তিন মাসে আর্থিক বৃদ্ধি র হার মাত্র ৫.৩ শতাংশে নেমে আসা-ই তার স্পষ্ট প্রমাণ। এই তিন মাসে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন সঙ্কুচিত হয়েছে ২.২ শতাংশ; আগের বছরে এই বৃদ্ধি র হার ছিল ৬.৯ শতাংশ।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা আলোর মতো স্পষ্ট যে, বিশ্ব আর্থিক মন্দার হাত থেকে ভারতও রেহাই পায়নি। বছরের শুরুতেই দেশের অন্যতম বৃহৎ তথ্য প্রযুক্তি রপ্তানী কোম্পানী সত্যম কম্পিউটারস্ দেউলিয়া খাতায় নাম লিখিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পে মন্দা রুখতে পরপর তিনবার আর্থিক উজ্জীবন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে — ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে। এর ফলে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে চলে গেছে। এর পরিণামে দেশের অর্থনীতির হাল কি হবে সেটা দেখানো এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। লেখাটির মূল লক্ষ্য হল প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর ভুল তথ্য প্রদান। জেনেশুনে কেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী তথ্য গোপন করলেন? হিসাবে গরমিল করাটা যদি কোনও বে-সরকারি ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষে অপরাধ হয় তাহলে তা সরকারি ব্যক্তি বা দপ্তরের পক্ষে তা আইনি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না কেন?

জাদুকরগণ যেমন হাত-সাফাই করে মানুষ ঠকিয়ে জীবন ধারণ করে;তাদের আমরা বলি 'জাগলার'। তেমনি দেশের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রবহীন বিদেশ থেকে অর্থনীতির পাঠ নেওয়া অর্থনীতিবিদগণ পরিসংখ্যানের 'পাজ্‌ল' বা ধাঁধা সৃষ্টি করে শুধু মানুষ ঠকিয়ে জীবন ধারণ করে না, তারা রাষ্ট্রীয় অর্থ এবং অর্থনীতিকে লুণ্ঠন করে পঙ্গু করে। এরা অর্থনীতিবিদ নয়। এদের স্ট্যাটিস্টিকাল পাজ্‌লার বলাই ভাল। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অসীম দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা নিয়ে চিরকালই পরিসংখ্যানের ধাঁধা সৃষ্টি করে ঘাটতিহীন বাজেট পেশ করেছেন। কেন্দ্রীয় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম তো একজন নামকরা পাজ্‌লার (Puzzler)। তিনি যত না অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করেন, তার চেয়ে বেশি করেন কবিত্ব। তার বাজেট আয় -ব্যয়ের সঠিক হিসাব পেশ এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ণের দিশা জ্ঞাপন নয়, তার বাজেট যেন এক অর্থনৈতিক দর্শন। ২০০৬-০৭-এর বাজেট বক্তৃতায় যেমন তিনি বলেছিলেন, "উন্নয়ণই হচ্ছে দারিদ্র্যের সর্বোত্তম প্রতিষেধক — উন্নয়ণ হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, সমানাধিকার আমাদের সাথী এবং সামাজিক ন্যায়বিচারই আমাদের গন্তব্যস্থল"। "এরকম কথার ধাঁধা ও পরিসংখ্যানের জাগলারি চিদাম্বরমের গত ৪ বছরের প্রায় সবকটি বাজেটেই পাওয়া যায়। বছরের পর বছর তিনি আমদানী শুল্ক কমিয়ে গেছেন। আর রপ্তানী শুল্ক বাড়িয়ে গেছেন, উৎপাদন শুল্ক বাড়িয়ে গেছেন। পরিণামে আমাদের বাজার ভরে গেছে আমদানীকৃত বিদেশী দ্রব্যে আর অন্যদিকে দেশি দ্রব্য রপ্তানী শুল্ক, উৎপাদন শুল্ক প্রভৃতির চাপে বিদেশে কম দামে রপ্তানী করতে পারেনি। দেশের মধ্যেও বিদেশী কম দামী জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। ফলে অনেক কোম্পানী উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

> **"সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে হিসাবে পেশ করেছেন তাতে ০৭-০৮ এ আর্থিক ঘাটতি দেখানো হয়েছিল ১,২৬,৯১২ কোটি টাকা। কিন্তু ভারত সরকারের প্রধান হিসাব পরীক্ষক সংগঠন কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক রিপোর্টে জানিয়েছে যে, সরকার আর্থিক ঘাটতি কম করে দেখিয়েছে।"**

এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রীর নয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রণব মুখোপাধ্যায় যে সমস্ত ভুল বা বেঠিক পরিসংখ্যান দিয়েছেন সেরকম কয়েকটি তথ্য দিয়েই এই লেখা শেষ করব। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ০৯ সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে হিসাবে পেশ করেছেন তাতে ০৭-০৮ এ আর্থিক ঘাটতি দেখানো হয়েছিল ১,২৬,৯১২ কোটি টাকা। কিন্তু ভারত সরকারের প্রধান হিসাব পরীক্ষক সংগঠন কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, সরকার আর্থিক ঘাটতি কম করে দেখিয়েছে। ঘাটতি হয়েছে ১,৬৪,৯৬২ কোটি টাকা। দেখিয়েছে ১,২৬,৯১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩৮,০৫০ কোটি টাকা গায়েব। অনুরূপভাবে রাজস্ব ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৫২,৫৬৯ কোটি টাকা, হবে ৮৫,৪৩৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৩২,৮৬৬ কোটি টাকা গায়েব।

এবারের 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' বাজেটে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, "তাদের পাঁচ বছরের জমানায় খাদ্য উৎপাদন প্রতি বছর প্রায় এক কোটি টন করে বাড়তে বাড়তে ২০০৭-০৮ বছরে সর্বকালীন রেকর্ড ২৩ কোটি টনে পৌঁছেছে।" এটি সর্বৈব মিথ্যা। বাজপেয়ীজীর এন ডি এ সরকারের শেষ বছরে (২০০৩-০৪-এ) খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল ২১৩.১৬ মিলিয়ন টন। পরের বছর অর্থাৎ ইউ পি এ সরকারের প্রথম বছরে (২০০৪-০৫) উৎপাদন কমে দাঁড়ায় ১৯৮.৩৬ মিলিয়ন টনে। ২০০৫-০৬-এ একটু বেড়ে দাঁড়ায় ২০৮.৫৯ মিলিয়ন টনে, ০৬-০৭-এ হয় ২১৭.২৮ মিলিয়ন টন, ২০০৭-০৮-এ খাদ্য উৎপন্ন হয় ২২৭.৩২ মি. টন; অর্থাৎ এই একমাত্র বছর যখন আগের বছরের তুলনায় উৎপাদন ১০ মিলিয়ন টন (১ কোটি টন) বেড়েছে। তবে পরের বছরই অর্থাৎ ০৮-০৯-এ উৎপাদন মাত্র ৩.৪৬ মি. টন বেড়েছে। আর ০৯-১০ বছরের উৎপাদনের যে আগাম আভাস পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে উৎপাদন আরও প্রায় ৩ মিলিয়ন টনের মতো কমে যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস চালিত ইউ পি এ সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে কারচুপি করে শুধু আর্থিক ঘাটতি ও রাজস্ব ঘাটতিই কম করে দেখাননি; খাদ্য উৎপাদনের হিসাবেও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। হিসাবে গরমিল দেখানোর জন্য সত্যম কোম্পানীর প্রধানকে যদি গ্রেপ্তার করা যায়, তাহলে পাবলিক মানির হিসাব দেখানো নিয়ে গরমিল করার জন্য অর্থমন্ত্রীকে এবং আর্থিক মন্দা বা সংকটকে চেপে রেখে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেন সি বি আই তদন্ত করা হবে না?

কলকাতা উত্তরের ভোটাররা কি নিজেদের কেন্দ্রকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মর্যাদার আসনে দেখতে চান ?

শিবাজী গুপ্ত

কলকাতা আর কলকাতাতে নেই। তার কৌলীন্য গেছে। কলকাতার অঙ্গহানি ঘটেছে। তার পূর্ব পশ্চিম হারিয়ে গেছে, এখন কলকাতা শুধু উত্তর ও দক্ষিণ।

কলকাতা আর কল্লোলিনীও নয়। কল্লোলিনী কলকাতাতে এখন বলা যায় উলঙ্গিনী কলকাতা। তার উলঙ্গ চিত্র মানুষ দেখেছে সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে। সম্প্রতি স্টেটসম্যান হাউসের সামনে বেলেল্লাপানায়। আর বছর বছর মহরমের শোভাযাত্রার জঙ্গিপনায় উলঙ্গিনী কলকাতার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ দেখছে কলকাতাবাসী।

কলকাতার রাজনৈতিক গুরুত্ব শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে। ভারতের অন্যান্য রাজধানী শহরের যখন বাড়বাড়ন্ত অবস্থা, তখন কলকাতা শহরের ডালপালা ছাঁটা বৃক্ষের দশা; সমূলে উৎপাটিত হবার সম্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে।

এককালে কলকাতায় চারটি লোকসভা আসন ছিল : পরে সেটা তিনটি আসনে দাঁড়ায়। বর্তমানে সে লোকসভা আসন মাত্র দুটিতে এসে ঠেকেছে। অনুরূপভাবে ২৪টি বিধানসভা আসন কমে ১৪টিতে নেমেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর — লণ্ডনের পরেই যার ছিল বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব। সেটি যেন একটি জেলা শহরের দশায় পৌঁছেছে।

লোকসভার জন্য কলকাতার যে দুটি আসন নির্ধারিত হয়েছে সে দুটি হল কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ। দুটি আসনেই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। অর্থ বল এবং পেশী বলে বলীয়ান তারা হয়তো জিতেও যাবে। তার নীট ফল — রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র,

কোনও প্রার্থীকে নিয়ে কোনও নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচকরা যদি গর্ববোধ করতে চান, তাহলে অধ্যাপক তথাগত রায়ই তেমন একজন নিষ্কলঙ্ক, নিরহঙ্কার, জ্ঞানেগুণে উচ্চশির প্রার্থী বলে স্বীকৃতি পাবেন।

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের শহরের প্রতিনিধিত্ব করবেন দুইজন — যারা জাতীয়তা-বিরোধী, হিন্দুত্ব বিরোধী, ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী।

কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রের কথা ছেড়ে দিই। কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের কথাই বলছি। এই উত্তর কলকাতা ছিল বাঙ্গালী কৃষ্টি সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, যাত্রা-নাটক, খেলাধূলা, ধর্মসংস্কার, স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের পীঠস্থান। আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের স্ফুরণ ঘটে মধ্য ও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলেই। এক কথায় বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু বাঙালীর যা কিছু গর্ব তা কেন্দ্রীভূত ছিল উত্তর কলকাতায়, পরে তা ছড়িয়ে পড়ে বাংলার দিগদিগন্তরে।

তথাগত রায়

বর্তমানে সে উদ্দীপ্ত কলকাতা নির্জীব মুমূর্ষু — তার প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। এমন কী উত্তর কলকাতার জনপ্রতিনিধিত্বও হিন্দুদের হাতছাড়া। তার সাংস্কৃতিক জীবনের মরণদশা চলছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত ও বহু পরিচিত অনেক বিধানসভা কেন্দ্র লোপাট হয়ে গেছে। যে সমস্ত গৃহপ্রাঙ্গণ, উদ্যানবাটি, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদাগার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাগার, কৃষ্টি সংস্কৃতি'র চর্চা ও অনুশীলন কেন্দ্র, নাট্যচর্চা ও প্রেক্ষাগৃহ একদা ছিল কর্মমুখর ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, সে সবই মৃত, জীবন্মৃত বা শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষায়। উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের এই অবক্ষয় ও অবনমনের জন্য দায়ী গত ৬২ বছর যারা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং এখন আছে । তারা কবরের উপর Epitaph-এর মতো এক একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপের উপর "Heritage place"-এর সাইনবোর্ড সেঁটে দিয়ে কর্তব্য সম্পন্ন করছে। এতে কী আর উত্তর কলকাতার পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার হবে?

১৯৪৬ সালের কলঙ্কিত ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে যখন সমগ্র মধ্য ও পূর্ব কলকাতা জ্বলছিল, হত্যা লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতনে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিল, তখন উত্তর কলকাতার নির্ভীক যুবকেন্দ্রটিই এগিয়ে এসেছিল পরিত্রাতার ভূমিকায়। ধর্মতলা থেকে শুরু করে হাঙ্গামাকারীরা হিন্দুদের যথাসর্বস্ব ধ্বংস করে যখন মেছুয়াবাজার ও ঠনঠনিয়া পর্যন্ত এগিয়েছে তখন উত্তর কলকাতাবাসী যুবকশ্রেণী রুখে দাঁড়িয়েছিল বলেই উত্তর কলকাতা গুণ্ডার কবল থেকে রক্ষা পায়।

কলুটোলা, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউর দুই পাশ, মন্দির স্ট্রীট, বর্মন স্ট্রীট, বালমুকুন্দ মক্কর রোড, নীলমাধব সেন লেন, চিৎপুর রোড, হ্যারিসন রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, টেরিটি বাজার, রাজমোহন স্ট্রীট, ফিয়ার্স লেন, আমড়াতলা স্ট্রীট, এজরা স্ট্রীট ইত্যাদি মাড়োয়ারি ও বাঙালী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে লুট-পাট, অগ্নি সংযোগ এবং হত্যা চলেছিল নির্বিবাদে। আনন্দীলাল পোদ্দার, ডি পি খৈতান, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকদের মতো বিশিষ্ট হিন্দু মাড়োয়ারি পরিবারগুলিও গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি।

এককালে বড়বাজার জোড়াসাঁকো জোড়াবাগান বিধানসভা কেন্দ্র থেকে হিন্দিভাষী প্রার্থীরা অনায়াসে নির্বাচনে জিতে যেতেন। বর্তমানে সে খোদ বড়বাজার কেন্দ্রটিও মুসলমান বিধায়কের দখলে এবং বড়বাজারের সদর তো বটেই অলিগলিতেও মুসলমানরা ঢুকে পড়েছে। আগামী নির্বাচনে বড়বাজার বলে কোনও নির্বাচন কেন্দ্রই থাকবে না। সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার মাঝখানে যে বড় বাজার ও হ্যারিসন রোড সেন্ট্রাল এভিনিউর ছিল বিভাজন রেখা, সেটি লুপ্ত হয়ে পুরো উত্তর কলকাতা গুণ্ডা, লোচ্চা ও সন্ত্রাসীদের আগ্রাসনের শিকার হয়ে পড়েছে। এখন উত্তর কলকাতাকে রক্ষা করবার মতো তেজী হিন্দু যুবক শ্রেণীও অবলুপ্ত।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যে কয়জন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী অধ্যাপক তথাগত রায়ের সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞানে গুণে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদে ঘোর আস্থাবান অধ্যাপক রায়ের সঙ্গে কোনও জাতীয়তা বিরোধী ও হিন্দুত্বের বিনাশকারী এবং স্বধর্মত্যাগী প্রার্থীরই তুলনা চলে না। কোনও প্রার্থীকে নিয়ে কোনও নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচকরা যদি গর্ববোধ করতে চান, তাহলে অধ্যাপক তথাগত রায়ই তেমন একজন নিষ্কলঙ্ক, নিরহঙ্কার, জ্ঞানেগুণে উচ্চশির প্রার্থী বলে স্বীকৃতি পাবেন।

একদা কলকাতা থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের মতো সর্ব গুণে গুণান্বিত প্রার্থীরা ভারতের লোকসভায় কলকাতা তথা বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। বহুদিন পর আবার সে সুযোগ এসেছে। কলকাতা-উত্তর কেন্দ্রের ভোটাররা যদি নিজ নির্বাচন কেন্দ্রকে পুনরায় সর্বভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করতে চান, তাহলে সম্প্রদায় নির্বিশেষে অধ্যাপক তথাগত রায়কে ভোট দিয়ে নিজেদের নির্বাচন কেন্দ্রের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারেন, নিজেরাও গৌরব বোধ করতে পারেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা

প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াই বিজেপি প্রার্থীকে এগিয়ে রেখেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এবার 'পশ্চিম ত্রিপুরা' লোকসভা কেন্দ্রে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে অবতীর্ণ ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি নীলমণি দেব। তাঁর নিজের আশা, ফলাফল চমকপ্রদ হবে। কারণ রাজ্যে বামফ্রন্টের দুঃশাসন, ভয়াবহ বেকার সমস্যা, জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম, ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদ ও দুর্নীতির ফলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী (Anti-Incumbancy) হাওয়া বইছে।

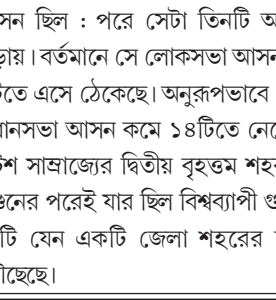

রাজ্যের মানুষ এবার অতিষ্ঠ। চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে শাসক দল সি পি এম ছাড়াও কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-এর প্রার্থীরা রয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু নির্দল প্রার্থী আছেন। ১৯৮৭ সাল থেকেই নীলমণি দেব ভারতীয় জনতা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। সাধারণ সদস্য থেকে ধাপে ধাপে সম্পাদক, রাজ্য সমিতির সদস্য থেকে বর্তমানে রাজ্য কমিটির সভাপতি। নিজের ঠিকাদারী ব্যবসা ছেড়ে দলের পূর্ণকালীন কর্মী। শ্রীদেব ইতিমধ্যে ৩০টি স্থানে কর্মী সম্মেলন সেরে

নীলমণি দেব

নিয়েছেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় মোট বুথের সংখ্যা ১৫৫৮ টি। অর্ধেক বুথে বুথ কমিটি গঠন হয়ে গিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে নীলমণিবাবু পাঁচ হাজার-এর মতো ভোটারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন। মোট ভোটার ১০ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩৪ জন। এদের মধ্যে আট লাখ ভোটার বরাবর ভোট দেন। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে বিজেপি-তৃণমূল জোট ছিল। প্রার্থী ছিল বিজেপি-র। সেবার প্রদত্ত ভোটের ২৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী। এবার কংগ্রেস জোট থেকে আই এন পি টি অর্থাৎ জনজাতিদের দলের একটা বড় অংশ নতুন দল গঠন করে বিজেপিকে সমর্থন করছে। দলের নেতা অনিমেষ দেববর্মা বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে জনসভায় বক্তৃতা করছেন। বিজেপি-র রাজ্য নেতা সুন্দর পালের কথায় কুড়ি শতাংশ ভোটারই ফ্লোটিং। সেই ভোট যেদিকে পড়বে সেই দলই জিতবে। সেই ভোট টানতে দিনরাত এক করে খাটছেন দলের নেতা-কর্মীরা। ১৬ মে বোঝা যাবে বাস্তব অবস্থা কী হয়?

(গত ৩ মার্চ দলীয় কার্যালয়ে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত)

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম কোণঠাসা হয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত

নিশাকর সোম

লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, এ-রাজ্যের সিপিএম নেতৃত্ব ততই দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রাথমিক বা সমীক্ষাতে দেখা গেছে যে কোনও কেন্দ্রই নিরাপদ নয় — প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই কঠোর এবং কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

এই অবস্থায় রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীকে রাজ্য দপ্তরে এনে এক সভা করে। সেই সভায় বুদ্ধবাবু তীব্র সমালোচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পার্টি সম্পাদকমণ্ডলীর। তিনি বলেন যে, দলাদলি করেই এই অবস্থা হয়েছে। বহু-পূর্বেই এই কলামে লেখা হয়েছিল যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও দার্জিলিং, পার্টির দায়িত্ব ছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপর। আর এই দুই জেলাতেই পার্টির অবস্থা শোচনীয়। কারণ বুদ্ধবাবু নিজের মনের মতোন লোকদের মারফৎ কাজ করিয়েছেন। সমগ্র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বোপরি বুদ্ধবাবু এই দুই জেলার জেলা কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারতেন না।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর ওই সভার আলোচনায় জানা গেল, এই জেলার কোনও আসন সম্পর্কে জয়ের গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না। উপরন্তু দু'টি আসনে নিশ্চিত পরাজয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই সভার দক্ষিণ ২৪ পরগণা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের অবস্থা শোচনীয়। যুক্তি হল — ৭টি বিধানসভা নিয়ে গঠিত এই লোকসভা কেন্দ্রের ৪টি বিধানসভা বিরোধীদের দখলে। এর মধ্যে আছে সদ্য নির্বাচন সাঙ্গ বিষ্ণুপুর, যেখানে সিপিএম প্রায় অর্ধলক্ষাধিক ভোটে পরাজিত হয়েছে। অতএব এটি নিশ্চিত খরচের খাতায়।

ঠিক প্রায় একই অবস্থা যাদবপুর এবং জয়নগর কেন্দ্রে। সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুলভাবে সিপিএম পরাজিত হয়েছিল।

উত্তর ২৪পরগণাতে, দমদমেও অমিতাভ নন্দী বেশ বিব্রত। কারণ এই কেন্দ্রে শেষমেশ সুভাষ চক্রবর্তীর অনুগামীরা কি করবেন সে সম্পর্কে অমিতাভ নন্দী সন্দিহান। যদিও সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব সুভাষ বাবুকে দমদম থেকে সরিয়ে লক্ষ্মণ শেঠ-কে সাহায্য করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। তথাপি সুভাষ চক্রবর্তী প্রতিটি সভায় উপস্থিত হচ্ছেন।

উল্লেখ করা দরকার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নেতারা পার্টির এই সঙ্গীন অবস্থার জন্য রাজ্য-নেতৃত্ব, বিশেষ করে বিমান-নিরুপম-বুদ্ধ — এই ত্রয়ীকে দায়ী করেছে। সম্প্রতি সিপিএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য তথা সিটুর সর্বভারতীয় সভাপতি নন্দীগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি ও সরকারের নেতৃত্বের ভুলের কথা — পুলিশের গুলি চালনাকে অনুচিত কাজ বলে বিবৃত করেছেন।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা নেতৃত্ব বুদ্ধ-বিমান-নিরুপমকে বক্তা হিসাবে চাননি। তারা গৌতম দেব এবং অমিতাভ বসু (বড়দা)-কে দিয়েই বক্তৃতা করাচ্ছেন।

কলকাতা জেলাতেও এই ব্যবস্থা — বিমান-বুদ্ধ-শ্যামল নন, দায়িত্ব পেয়েছেন মানব মুখার্জি, রঘুনাথ কুশারী, কালী ঘোষ-রাজদেও গোয়ালা ও মহঃ সেলিম।

> **"দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নেতারা পার্টির এই সঙ্গীন অবস্থার জন্য রাজ্য-নেতৃত্ব, বিশেষ করে বিমান-নিরুপম-বুদ্ধ — এই ত্রয়ীকে দায়ী করেছেন। সম্প্রতি সিপিএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য তথা সিটুর সর্বভারতীয় সভাপতি নন্দীগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি ও সরকারের নেতৃত্বের ভুলের কথা — পুলিশের গুলি চালনাকে অনুচিত কাজ বলে বিবৃত করেছেন।"**

মুর্শিদাবাদ জেলাতে একটি কেন্দ্রেও পার্টি নেতৃবৃন্দ জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কথা বলতে পারছেন না। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই জেলা থেকে সিপিএম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর উপর এখানে আরএসপি — সিপিএম তিক্ততার ফল দেখা যাচ্ছে এবং তা ভোটেও দেখা যাবে।

উত্তরবঙ্গে আরএস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে কলহের ফলে নির্বাচনী সংগঠন অথবা প্রচার অভিযান এখনও সংগঠিত হতে পারছে না। দার্জিলিং-এর পাহাড় অঞ্চলে সিপিএম যেতেই পারছে না। এই দার্জিলিং জেলার সংগঠনের দায়িত্ব ছিল বুদ্ধদেববাবুর। তিনি কিছুই করেননি।

পুরুলিয়া আর বাঁকুড়াতে মাওবাদী ভীতির ফলে রাত্রিবেলা সিপিএম কর্মীরা নির্বাচনী কাজেই বের হন না। এদিকে পুরুলিয়া জেলাতে জনৈক রাজ্য নেতার জেলা সভাধিপতির প্রতি আনুকূল্য নিয়ে নানা কথা উঠতে শুরু করেছিল। আপাতত সেটা স্থগিত আছে।

বাঁকুড়াতে বাসুদেব আচারিয়াকে প্রার্থী করার বিপক্ষেই ছিলেন জেলা তথা রাজ্য নেতৃত্ব। ঠিক ছিল বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে-কে দাঁড় করানো হবে। তিনি জিতলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যেতো। বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীর পদে অঞ্জন বেরাকে বসানো হত। কিন্তু কোনও কেন্দ্রেই পরিবর্তন করার ঝুঁকি নেওয়ার সাহস সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব দেখাতে পারেননি।

পূর্ব মেদিনীপুরের দু'টি কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থীর পরাজয়টা পার্টি নেতৃত্ব আগেই ঠিক করে রেখেছেন।

কলকাতা উত্তরের পার্টি কর্মীরা যোগ-বিয়োগ কাটাকুটি করে মহঃ সেলিমের জয় দেখছেন। তারা দেখছেন না — বড়বাজার এলাকা। শুধু কলকাতা নয়, প্রায় সব জেলাতেই পার্টি কর্মীরা ঘরে বসেই প্রথম স্ক্রুটিনি শেষ করেছেন। তদনুযায়ী রিপোর্ট দিয়েছেন। এর ফলে আসল সত্য চাপা থাকবেই। আসলে তারা মানুষের সামনে যেতে পারছেন না। শুধু মিছিল করাতেই ব্যস্ত অথবা কর্মীসভা করাতে সময় ব্যয় করছে। আবার, ঢাঁক পিটিয়ে প্রচারের ঢং দেখা যাচ্ছে। প্রার্থী নিজের প্রচারের ঢাক নিজেই বাজাচ্ছেন। বিরুদ্ধ মতের মোকাবিলা করার সাহস চলে গেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, বিষ্ণুপুরের ভূত তাড়া করছে। প্রতিটি জেলাতেই গরীব মানুষ-ক্ষেত মজুর-বস্তিবাসী সিপিএম-এর বিরোধীদের ভোট দেবেন। ছিঃ! সিপিএম! তারা আজ সিপিএম-কে মনে করেন ধনিক-বণিকদের পার্টি। গ্রামে গ্রামে গরীব মানুষরা দেখলেন যে পার্টি নেতারা দু'বেলা ভালভাবে খেতে পেতেন না, তাঁরা বিশাল বাড়ি-গাড়ি বিত্তের অধিকারী। আর নীচের তলার গরীব ক্ষেত মজুররা যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়েছেন। যথা পূর্বং তথা পরং। তেলা মাথায় তেল পড়ছে। শিল্পায়ণের স্লোগান এই ক্ষেত্রে কোনও দাগ কাটতে পারেনি। রাজ্য নেতারা যখন জেলায় যান তখন থাকেন সব থেকে ধনী কমরেড ব্যবসায়ী বা জোতদার-এর বাড়িতে। চব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয় উদরস্থ করে ভাষণ দিয়ে কর্মীদের বাধিত করেন। তার ফল ফলতে শুরু করেছে।

পার্টি নেতৃত্ব বিশেষ করে ধমকের সুরে বক্তৃতা করার স্বভাব বুদ্ধ-বাবুরা এখনও ছাড়তে পারছেন না। ফলে জনগণ মনে করছেন নেতারা কি অহঙ্কারী। অহঙ্কারের মণির মালা ফেলতে হবে পথের ধূলায়। সেদিন বোধ হয় চৈতন্য হবে? আসলে রাজ্য সিপিএম-এর নেতৃত্বের মধ্যে গর্বাচভ তৈরি হয়েছে বলে প্রচারও শোনা যাচ্ছে।

গোটা রাজ্যে এখনও সিপিএম তথা বামফ্রন্টের প্রচার আত্মরক্ষামূলক। যেন বিধানসভা নির্বাচন। তাই ৩২ বছরের সালতামামি নিয়েই সবাই ব্যস্ত। ভুলে গেলে চলবে না — ইউপিএ সরকারের পারমাণবিক চুক্তি ছাড়া আর সব বিষয়ই বামপন্থী দলগুলি সমর্থন করেছিল। কাজেই ইউপিএ সরকারের ভাল-মন্দের জন্য বামপন্থী দলগুলিও কম দায়ী নয়। একটা কথা পরিষ্কার যে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের উপর পশ্চিমবঙ্গের তথা কেন্দ্রীয় সিপিএম নেতৃত্বের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। ফলাফলের ভিত্তিতে পার্টির মধ্যে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম শুরু হবেই।

(এরপর ৬ পাতায়)

অন্য রকম

রাজকুমারের সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভক্তের ভগবান কথাটা রাজকুমার তার সৃষ্টি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। নিজের হাতে হনুমান চল্লিশা তৈরি করে দেখিয়ে দিয়েছেন — ভগবান বহুরূপে মানুষের হাতে ধরা দেন। বিশ্বের সব থেকে ছোটো হনুমান চল্লিশা-র মৌলিক সৃষ্টিই — রাজকুমারকে মেলে ধরেছে সকলের কাছে। তার কপালে বয়ে এনেছে সৌভাগ্যের বিজয় তিলক।

এলাহাবাদের রাজকুমার বর্মা। ৫৭ বছর বয়সী রাজকুমার নিজের সৃষ্টিতে ডুবে থাকতে ভালোবাসেন। নব নব সৃষ্টির আনন্দই তার চোখে-মুখে বয়সের ছাপ ফেলতে দেয়নি। নিজের মোবাইল বিক্রির বড় ব্যবসা থাকলেও, মৌলিক কিছু সৃষ্টি করার আনন্দটা রাজকুমারের বেশি পছন্দের। ৩৩ বছর ধরে তিনি এই সাধনাই করে আসছেন। ১৮ মাস ধরে ৮৮০টি চাল দিয়ে ভারতমাতার মূর্তি তৈরি করে প্রথম সবার নজর কাড়েন। শুধু নিজের পরিবার নয়, প্রতিবেশীরাও গর্ব করেন তার সৃষ্টিতে। তার পর থেকে রাজকুমারের আবিষ্কার থেমে থাকেনি। শুধু যে ভারতমাতার মূর্তি তা নয়, সৃষ্টি করেছেন আরও অনেক। প্রমাণ করেছেন মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। রাজকুমার তাঁর সৃষ্টির বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অর্থও পান। তবে এ সমস্ত সৃষ্টিকর্ম তার পেটের ভাত যোগানোর জন্য নয়। কাজের ফাঁকে, মনের আনন্দে কখন কি সৃষ্টি হয়, তিনি নিজেও তা ঠাহর করতে পারেন না। এ সবই মৌলিক। তার কাছে এসবের কোনও ধরা বাঁধা সংজ্ঞা নেই। ভারতমাতার মূর্তির দাম উঠেছিল ১৫ হাজার টাকা। বিক্রিও করে দিয়েছেন তা, অবশ্য পয়সার জন্য নয়। তার সৃষ্টি অন্যকেও আনন্দ দেবে — এই ভাবনাটাই তার কাছে বড়।

রাজকুমারের হনুমান চল্লিশা।

রাজকুমারের ক্ষুদ্র সৃষ্টির রেকর্ডে কে নেই, ০৯-এর ক্যালেন্ডার থেকে চিত্র তারকা আমির খান — সবারই ক্ষুদ্র রূপ তুলে ধরতে মাহির তিনি। চিত্র নির্মাতা রাজকুমার সন্তোষিও ফুটে উঠেছে, রাজকুমারের হাতে — চালের মাধ্যমে।

এনডিএ-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী এল কে আদবানীও আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন - রাজকুমারের সৃষ্টিতে। তিনিও আজ ক্ষুদ্র সৃষ্টির ফাঁকে দীপ্তমান আদবানী।

আর এইসব সৃষ্টির মাঝে হনুমান চল্লিশা-র সৃষ্টিটা-ই রাজকুমারের বেশি প্রিয়। ৪৫ পৃষ্ঠার হনুমান চল্লিশায় যেন রাজকুমারকে নিখিল বিশ্বে সাচ্চা ভক্তরূপে তুলে ধরেছে। ২২টি আলাদা আলাদা ছবিও রয়েছে ওই ক্ষুদ্রতম হনুমান চল্লিশায়। ৬ মাস ধরে যেটি গড়ে তুলেছেন তিনি। অষ্টম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হ্যান্ডিক্র্যাফট ফেয়ার-এ হনুমান চল্লিশাটি ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে। রাজকুমার এই সঙ্গে পেয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার। তার সাধনা সফল। হনুমানের সাচ্চা ভক্ত তিনি।

অসমে অগপ-বিজেপি সমঝোতা
দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে কংগ্রেসের

শিলচর থেকে বাসুদেব পাল

শিলচর ও করিমগঞ্জ — অসমের বরাক উপত্যকায় দুটি লোকসভা কেন্দ্র। এবারের লোকসভা নির্বাচনে দুই সর্বভারতীয় দল বিজেপি ও কংগ্রেস সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিগত ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসনেই কংগ্রেস বিজয়ী হলেও এবার তাদের পক্ষে আসন দুটি দখলে রাখা বেশ মুশকিল। তাই অবস্থা বেগতিক বুঝে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে কংগ্রেস। এরকম অভিযোগ বলতে গেলে সব বিরোধী দলেরই। মাত্র ক'দিন আগেই করিমগঞ্জ জেলার জেলাশাসককে বদলি করা হয়েছে। গত ২৭ মার্চ শিলচরে জেলাশাসকের কার্যালয়ে এক বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিজেপি'র কবীন্দ্র পুরকায়স্থ সদলবলে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান। সেখানে নিয়ম মেনে সঙ্গীদের বাইরে রেখে কবীন্দ্রবাবু মনোনয়ন জমা দিতে অফিসের ভিতরে যান। অথচ পরমুহূর্তে সন্তোষমোহন দেব কিন্তু পুরো দলবল নিয়েই জেলাশাসকের দপ্তরে ঢুকে পড়েন। এই নিয়ে বাইরে অপেক্ষমান বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীরা তীব্র প্রতিবাদ জানাতে তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের হাতাহাতি হয়।

পরে উভয়পক্ষই উভয়-এর বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করেছে।

এদিকে ২৫ মার্চ শিলচর ও করিমগঞ্জ-শহরে এন ডি এ-এর প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানী বিরাট জনসভা করেন। সেখানে বিজেপি-র শিলচর ও করিমগঞ্জ আসনে দলীয় প্রার্থী যথাক্রমে কবীন্দ্র পুরকায়স্থ এবং সুধাংশু দাসও উপস্থিত ছিলেন। আদবানীজী তাঁদেরকে বিজয়ী করার জন্য জনতার কাছে আবেদন জানান। আদবানীজী তাঁর ভাষণে ব্যাপক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করেন। একই সঙ্গে আদবানীজী জানিয়ে দেন যে, বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদেরকে তাঁর দল শরণার্থী বলেই মনে করে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আদবানীজী বলেন, বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুরা অত্যাচারিত নির্যাতিত হয়ে অসম, পশ্চিমবঙ্গ বা দেশের যেকোনও স্থানে এলে তাদেরকে মর্যাদার সঙ্গে আশ্রয় দেওয়া হবে। এদেশের নাগরিক হিসেবে তাঁরা স্বীকৃতি পাবেন। করিমগঞ্জের সভায় আদবানীর বক্তব্য ছিল, সমস্যাদীর্ণ অসমের সার্বিক উন্নয়নে 'অনুপ্রবেশ সমস্যা'ই প্রধান প্রতিবন্ধক। অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানে রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের ভূমিকা নেতিবাচক। তার খেসারৎ দিচ্ছে নিরপরাধ সাধারণ মানুষ।

এর ঠিক দু'দিন বাদেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আদবানীজীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে বিদেশীদের মধ্যে বিভাজন করছে। এভাবেই তিনি বাংলাদেশীদের অসমে অবস্থানকে পরোক্ষে উৎসাহিত করলেন বলা যায়। বলা বাহুল্য, অগপ-বিজেপি আসন সমঝোতার ফলে কংগ্রেসের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তার উপর আদবানীজীর শিলচর ও করিমগঞ্জের জনসভায় বিশাল জনসমাগম কংগ্রেসের পক্ষে চিন্তার কারণ। এছাড়া আদবানীজী দিফু লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কুলেন্দ্র দাওলাগাপু-র সমর্থনে যে জনসভা করেন সেখানেও ছিল জনজোয়ার। প্রসঙ্গত, কুলেন্দ্র দাওলাগাপু উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন প্রধান কার্যনির্বাহী, ডিমাসা জনজাতি সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতা হিসেবে সুপরিচিত।

এদিকে শিলচরে আদবানীজীর সভার পরে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ দলীয় সাংসদ ও প্রার্থী সন্তোষমোহন দেব-এর সমর্থনে যে সভা করেন তা আদবানীজীর জনসভার তুলনায় এক চতুর্থাংশও নয়। নিতান্তই ফিকে। এটা এখন বরাক উপত্যকায় সর্বসাধারণের চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। সম্ভবত, সেই ব্যর্থতা ঢাকতে গত ৩১ মার্চ কংগ্রেস শিলচর ও করিমগঞ্জে প্রণব মুখার্জীর জনসভার ব্যবস্থা করে। সেই সভা তরুণ গগৈ-এর সভার তুলনায় আরও ম্রিয়মান। শিলচরে অনেক ছোট পরিসরে সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানেই খবর পৌঁছায় যে প্রণববাবু গৌহাটিতে পৌঁছালেও আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় শিলচর বা করিমগঞ্জে আসতে পারছেন না।

এদিকে কংগ্রেসের চিরাচরিত মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কে ধস নামিয়ে নবগঠিত অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের অভিযান অব্যাহত। দলের প্রধান মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল ইতিমধ্যেই শিলচর ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন। এছাড়া বদরুদ্দিনের নিজের ভাই মনোনয়ন জমা দিয়েছেন নওগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে। বরাক উপত্যকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি শিলচর লামডিং ব্রডগেজ রেলপথের। সেইসঙ্গে শিলচর শহরে উন্নত ড্রেনেজ সিস্টেম সহ ভালো রাস্তা-ঘাট এর কোনওটাই 'কাজের লোক' সন্তোষমোহন বা তাঁর স্ত্রী বীথিকা দেবী যিনি নিজে শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান — করে উঠতে পারেননি। ৩১ মার্চ শিলচর সভাস্থলেও সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে গেছে দেখা গেল।

শিলচর-এর জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেন যে, বরাক উপত্যকার জন্য কেন্দ্র থেকে যে ১০০ কোটি টাকা সন্তোষমোহনবাবু অনুমোদন করিয়ে এনেছিলেন তা তিনিই আটকে দেন। কেননা, সেক্ষেত্রে অসমের অন্যত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতো। শিলচরে দেওয়াল লিখন চোখে পড়ল — ব্রজগেজ ব্রডগেজ করে হাহাকার, রাজনীতি সন্ত্রাস একাকার। এরপরও সাধারণ মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দিলে তা অবাক করার মতো হবে।

ধনকুবের মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল এলাকার মুসলিম বিধায়ক। মৌলানা, মৌলবীদের এককাট্টা করে তাঁর দিকে টানতে সচেষ্ট। কাটিগড়া, বদরপুর ও হাইলাকান্দির এম এল এ তাঁর দলের। এই তিনটিআসন মিলিয়ে দুই লোকসভা কেন্দ্রের মোট ১৫ জন বিধায়ক। পাঁচজন বিধায়ক বিজেপির।

সেক্ষেত্রে ত্রিপাক্ষিক লড়াইয়ে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বিজেপি-রই। আবার চা বাগানবাসীদের ভোট টানতে বদরুদ্দিন করিমগঞ্জ আসনে রাজেশ মালাকে প্রার্থী করেছেন। তেজপুরে প্রার্থী করেছিলেন চা-বাগানবাসী জনজাতিদের প্রতিনিধি লক্ষ্মী ওঁরাও-কে। তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। তখন বদরুদ্দিন লক্ষ্মী ওঁরাও-এর বাবাকেই সেখানে দলীয় প্রার্থী করেন। এই সবকিছু মিলিয়ে অগপ -বিজেপি জোটেরই বেশিরভাগ আসনে জয়লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

তরুণ গগৈ

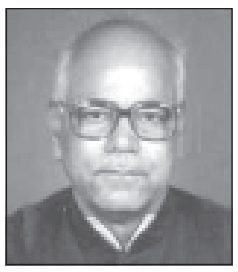
কবীন্দ্র পুরকায়স্থ

সন্তোষমোহন দেব

চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি

সিপিএম আত্মরক্ষায় ব্যস্ত

(৫ পাতার পর)

প্রকৃতিতে তীব্র উত্তাপ — উত্তাপ বাড়ছে নির্বাচনেরও। এই উত্তাপের তাপ নেবার জন্য সিপিএম-এর রাজ্য কমিটি একটি স্বল্প সময়ের জন্য সভা করে মূল্যায়ন করলো। এই মূল্যায়নে দেখা গেল — বামফ্রন্ট কম করে ২৫টি কেন্দ্রে সঙ্কটে আছে। নদীয়া জেলাতে ২টি কেন্দ্রের যা অবস্থা তাতে সিপিএম প্রার্থীদের পার হওয়া এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত। বিশেষ করে রানাঘাট কেন্দ্রে পার্টির একাংশ প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করছেন। মেদিনীপুরেও দুটি আসন হাতছাড়া হবেই। যদিও লক্ষ্মণ শেঠ বলছেন, তিনি জিতবেন। তবে তিনিও এটা ভালভাবে জানেন যে সেটা সম্ভব হলে — পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম কোনও সীটে হারবে না।

দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে যাদবপুর এবং মথুরাপুর হারার দলেই। এই জেলার সিপিএম-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে বিমান বসুও মুখ্যমন্ত্রী লেগে আছেন। উত্তর ২৪ পরগণায় দমদম কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী অমিতাভ নন্দীর বিরুদ্ধে তাঁর ভাগ্নে একটি সংস্থার স্বত্বাধিকারীর রেলের জমি দখল নিয়ে বিরাট প্রচার চালাচ্ছে। উপরন্তু এই কেন্দ্রে "শ্রীকৃষ্ণভক্ত" সুভাষ চক্রবর্তীর গোষ্ঠী অমিতাভবাবু হেরে যান — এটাই চাইছেন। তবে গনিখান চৌধুরীর কেন্দ্রে পারিবারিক ঝগড়ার কারণে কংগ্রেসের জয় অনিশ্চিত হয়ে গেছে। একইভাবে রায়গঞ্জ কেন্দ্রে প্রিয়জায়া দীপা মুন্সীর বিরুদ্ধে করিম চৌধুরীকে তৃণমূল কর্মীরা সমস্ত রকমের সাহায্য করছেন। ফলে এই কেন্দ্রেও কংগ্রেসের জয় অনিশ্চিত হবে। মহঃ সেলিমের বিরুদ্ধে নাকি জনৈক বিধায়ক নেতা কাজ করছেন, এসব বক্তব্যই রাজ্য কমিটির সদ্য সমাপ্ত সভায় পেশ করা হয়েছে। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে ছল-বল-কৌশল সব কিছু দিয়ে প্রতি বুথে ৫১ শতাংশ ভোট পেতে হবে। সিপিএম ভক্ত এক সাংবাদিক সেদিন বললেন — সিপিএম-এর এবারের প্রচার ম্যাড়মেড়ে। কোনও নেতাই উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন না। সিপিআই, আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে — বুদ্ধ বাবুর বক্তৃতা এবং বিমানবাবুর মন্তব্যসহ বক্তৃতা তাদের না-পসন্দ। তারা বললেন — সিপিআই -এর নন্দ ভট্টাচার্য, আর এস পি-র ক্ষিতি গোস্বামী এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের কোনও সভায় ডাকা হচ্ছে না।

বস্তুত মুখে বামফ্রন্টের বিস্তৃতি এবং ঐক্যকে দৃঢ় করার কথা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বললেও বাস্তবে সিপিএম ওয়ান পার্টি শো করে চলেছে। বামফ্রন্টের ছোট পার্টিদের তো পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না।

একটা কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি — তা'হল রাজ্য কমিটির সভাতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের — সিপিএম-এর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ার সমস্যাটাও বলা হয়েছে।

আর এসপি - ফরওয়ার্ড ব্লক - জোয়াকিম্-বাক্‌লা এবং বারাসত নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সিপিআই প্রাক্তন বিধায়কের দুর্নীতির জবাব দিচ্ছে উদয়াস্ত।

এতো গেল একটা দিক। অন্য দিকে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা — স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এস. বি)-এর রিপোর্টে প্রকাশ — উত্তর কলকাতায় সুদীপ ব্যানার্জি এগিয়ে আছেন। কারণ মুসলিম ভোট এবং বিজেপি-র একাংশ নাকি তাঁর পক্ষে। বড়বাজার বেশিরভাগ ভোট সিপিএম-এর বিরুদ্ধে যাবে। এস বি-এর এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূল নেত্রীর জেতার মার্জিন কমবেই।

তবে মনে রাখতে হবে সিপিএম-এর ম্যান, ম্যানি ও ম্যাসল-এর কাজ অতীব তীব্র এবং সুতীক্ষ্ণ। অতএব সংগঠন না থাকলে বিরোধীদের সমূহ বিপদ।

নূরখাঁন এখন নন্দদুলাল, জয় ভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রেম-নাটকের পরিণতিটা প্রেমিকের পক্ষে গেল না। ভণ্ডুল হয়ে গেল। হিন্দু সেজে হিন্দু নাম নিয়ে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি কয়েক বছর বসবাস করার পর প্রেমিক নূরখাঁন স্ত্রী ভারতী দাসকে নিয়ে সম্প্রতি নিজের বাড়িতে যাচ্ছিল। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার শনিছড়া গ্রামে তার বাড়ি। ধর্মনগর স্টেশনে নেমেই নূরখাঁন (হিন্দু নাম নিয়ে হিন্দু সেজেছিল) তার স্বরূপ ধারণ করে। সেদিন সে তিনবছর হিন্দু হিসাবে জীবনযাপন করা স্ত্রী ভারতী দাসকে শাঁখা - সিন্দুর ভেঙে মুছে ফেলতে বলে। যুক্তি দেখায় — ওটাই নাকি ওদের গ্রামের রেওয়াজ।

সন্দেহ জাগে ভারতীর মনে। ভারতী হিন্দু ছদ্মবেশধারী নূরখাঁনকে ১৪১২ বঙ্গাব্দের ১৪ জৈষ্ঠ তারিখে অসমের ঢেমাজি জেলার জোনাই শহরের নেপালী দুর্গামন্দিরে হিন্দুমতে বিয়ে করেছিল। পাশেই একজন বিবাহিতা হিন্দু মেয়েকে দেখে ভারতী স্বামীর কথা মানতে অস্বীকার করে। ততদিনে তার কোলে এসেছে এক জাতক। এখন যার বয়স দুই। এবার আর ভারতীকে শাঁখা ভেঙ্গে সিন্দুর মুছতে বাধ্য করাতে পারল না নূরখান। বাড়ির কাছে গিয়েই ভারতীর সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়। সে দেখে, সে প্রতারিত হয়েছে। স্বামী আসলে মুসলমান। নূর ভেবেছিল এতদিনে সে ভারতীকে মুসলমান হতে বাধ্য করবে। বাস্তবে তা হল না। রচিত হল নতুন এক রুদ্ধশ্বাস নাটক। ভারতী মুসলমান শ্বশুরবাড়ির কাছে গিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। আশ-পাশের হিন্দুরা এসে পড়ল। ভারতী মুসলমান বাড়িতে ঢুকল না। উল্টে থানায় গিয়ে স্বামীর নামে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করল। পুলিশ যথারীতি নূরখানকে গ্রেপ্তার করল। ভারতীকে শনিছড়া গ্রামের হিন্দুরা আশ্রয় দিল। তখন কিন্তু ভারতী আর তার স্বামীকে মেনে নিতে একেবারে রাজী নয়। প্রতারকের সঙ্গে ঘর করতে তার একটুও ইচ্ছা নেই। এখন স্থানীয় হিন্দুরা রাস্তা বের করল। নূর খানকে হিন্দু হতে পরামর্শ দিল। যথারীতি পুলিশের সামনে মন্দিরে গিয়ে যজ্ঞ করে পরাবর্তন হল নূরের। সে এখন নন্দদুলাল দাস। কোর্টে আগেই নাম বদলের এফিডেভিট করা হয়ে গিয়েছিল।

ভারতী আর ওখানে থাকতে রাজী হল না। গ্রামের মুসলমানরাও নন্দদুলালকে মেনে নিতে রাজী নয়। অগত্যা ভারতী ও নন্দদুলাল শিশু পুত্রকে নিয়ে ঢেমাজি জেলার জোনাইতে ফিরে গেল। জয় হল ভারতীর। জয় হল হিন্দু ভারতীর। এরকম কত ভারতী যে প্রেমের ফাঁদে পড়ে নতুন প্রজন্মের মুসলমান সৃষ্টি করে চলেছে কে না জানে? তবে ভারতী এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, সবার কাছে উদাহরণ।

নির্বাচনের মুখে তালিবানীরা কাশ্মীর সীমান্তে অপারেশন চালাতে তৎপর

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। তালিবান জেহাদিদের একটা বড় গোষ্ঠী জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে প্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে। তুষারপাতের আগেই তাদের একটা অংশ সীমান্তের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গা ঢাকা দিয়েছে বলে সীমান্ত রক্ষীরা জানতে পেরেছে। আগের থেকে বেশি শক্তি নিয়েই তালিবানরা

লড়াইয়ে নামছে। তাদের কাছে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রই শুধু নয়, সেই সঙ্গে স্যাটেলাইট ফোন, জিপিএস ও শীতের পর্যাপ্ত পরিধেয়ও রয়েছে বলে জানা গেছে। ভোটের আগে তালিবানীদের ভারতে ঢোকার চেষ্টা সীমান্ত বাহিনীর কাছেও এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। চলতি বছরের শুরু থেকেই জেহাদিদের নিশানায় রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর সীমান্ত। নিরাপত্তা রক্ষীরা জেহাদিদের উপদ্রবের কথা স্বীকার করেছেন। কয়েকদিন আগেই কাশ্মীরের কুপওয়ারায় তালিবানী গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। জানুয়ারি শুরুর দিকেও জেহাদীরা আক্রমণ চালিয়েছে সীমান্তে।

সে সময় পুঞ্চে ও দশ-বারো জন জেহাদিকে লক্ষ্য করা গেছিল। ২১, ২৩ ও ২৫ মার্চ সীমান্তে জঙ্গিদের সঙ্গে ছোটো-খাটো সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে হামেশায়ই জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা লেগেই থাকে। এর ওপর রয়েছে পাকিস্তানী জঙ্গিদের বাড় বাড়ন্ত। কয়েক বছরে পাকিস্তান সীমান্তে জঙ্গিদের বাঙ্কারও জম্মু-কাশ্মীরে বেড়েছে। যেগুলির বেশির ভাগই কংক্রিট দিয়ে তৈরি। যা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিএসএফ-এর কছেও। তেমনি বেড়েছে জঙ্গিদের অবৈধ প্রবেশও। জম্মু জোনের আই জি পি কে রাজেন্দ্রও এই ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছেন। তালিবানীদের লড়াইয়ে বাঙ্কারগুলো তাদের সাহায্য করবে বলে শ্রীরাজেন্দ্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানেই তা পরিষ্কার।

২০০৩ সালে ১৩৭৩ জন জঙ্গি সীমান্ত পেরিয়ে উপত্যকায় ঢুকেছে। ২০০৪-এ ৫৩৭ জন। ২০০৫-এ ৫৯৭ জন জঙ্গির প্রবেশ ঘটেছে। ২০০৬ সালে ৫৭৩ জন জঙ্গি অনুপ্রবেশ করেছে। ২০০৮ সালে ১৩০ জন ভারতে প্রবেশ করেছে। যা এখনও চলছে।

এবারের লড়াইয়ে তালিবান জঙ্গিদের হাত শক্ত করতে লস্কর এ তৈবা, হিজবুল, জৈশ-এ-মহম্মদের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলোও মদত যোগাচ্ছে। সরাসরি মদতের সম্ভাবনা রয়েছে আই এস আই-এর সঙ্গেও। এছাড়া আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের জেহাদিরাও এতে যোগ দিতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনের মুখে এই ধরনের বিপদকে হাল্কা ভাবে নিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা জারি করেছে। নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে রাজস্থানও পাঞ্জাবেও।

জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায় ১৬ এপ্রিল থেকে ১৩ মে লোকসভা ভোট। জেহাদিরা গত নির্বাচনে উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিয়েছিল। এবারের তালিবানীদের আগ্রাসী মনোভাব তাই সব দিক থেকেই ভয়ঙ্কর। এদিকে পাকিস্তানও এই বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছেনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের

মুখে থাকা পাকিস্তান এই বিষয়ে চুপ থাকবে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান। মার্কিন সেনাবাহিনীর জয়েন্ট চীফ অফ স্টাফ অ্যাডমিরাল মাইক মুলেন তালিবানী জঙ্গিদের প্রবেশের ঘটনায়, পাকিস্তানের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

তালিবানীদের সীমান্তে অপারেশনের খবর এক টি ভি সাক্ষাৎকারেরও উঠে এসেছিল। তাদের সীমান্তে প্রবেশের মূল লক্ষ্যই হল যেনতেন প্রকারেণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর জোর আঘাত হানা। যাতে সীমান্তের নিরাপত্তা মুখ থুবড়ে পরে। নির্বাচনের মুখে আবার জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকা অশান্ত হয়ে ওঠে।

কেরলে চার্চ এবার সরাসরি রাজনীতিতে নামছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে চার্চ এবার সরাসরি ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে চলেছে। এই লক্ষ্যে চার্চের পক্ষ থেকে যাজকদের হাতে একটি ৪৩ পৃষ্ঠার পুস্তিকা তুলে দেওয়া হচ্ছে। সেই পুস্তিকায় পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, রাজনীতি চার্চের কাছে অচ্ছুৎ নয়। কেরলে সাইরো মালাবার চার্চ এই পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

ওই পুস্তিকা বা হ্যাণ্ডবুকটি রোমান ক্যাথলিক, ল্যাটিন ক্যাথলিক এবং কেরলের সাইরো মালানকারা গোষ্ঠীভুক্ত চার্চের যাজকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। পুস্তিকাটির বক্তব্য কিন্তু ক্যাথলিক বিশপ কনফারেন্স অফ্ ইন্ডিয়ার গাইডলাইনের বিরোধী।

বইটির রচয়িতা 'র‍্যাফেল চিটিলাপল্লি' সাইরো-মালাবার চার্চের একজন প্রথম সারির অভিজ্ঞ ফাদার। বইটির শিরোনাম হল — 'কিরাথা কম্যুনিস্ট পাকা'। যার শব্দার্থ হল 'কম্যুনিস্ট আক্রমণের বদলা বা জবাব'। বামপন্থীদের চরম বিরোধিতার ফলে একটি রাজনৈতিক দল গড়ার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। বইটির শেষ অধ্যায়ের শিরোনামও হল — 'রাজনীতি কারও একার পৈতৃক বিষয় নয়'। ওখানে ফাদার চিটিলাপল্লি লিখছেন — সংগঠন জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ । রাজনীতিকে বাদ দিয়ে জীবন নয়। এই পদক্ষেপ সি পি এম নেতৃত্বাধীন বামপন্থী সরকারের চার্চের উপর লাগাতার আক্রমণের প্রতিফল। ফাদার আরও বলেছেন, বামপন্থী রাজ্য সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে ভয়ানক চাতুর্যের ফলে কেরলের খৃস্টানদের মনে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। সি পি এম রাজ্য সম্পাদক পিনারাই বিজয়ন নিজেই বিশপ জন চিটিলাপল্লিকে অসহনীয় ব্যক্তি বলে মন্তব্য করায় খৃস্টানদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়েছে। রাজ্য সরকার চার্চের পায়ে বেড়ি পরাতে চাইছে। রাজ্য সরকারের এই সব চার্চ-বিরোধী কাজের দরুণই ফাদারদের রাজনীতিতে যুক্ত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি কেরল রাজ্য সরকারের রাজ্য মহিলা কমিশন গরীব কমবয়সী মেয়েদের চার্চের ভিতরে পড়াশোনার নামে নিয়ে গিয়ে কম বয়সে 'নান'

করার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিল। আর কেরলের এক নান আত্মজীবনী লিখে চার্চের অভ্যন্তরে নানদের উপর যে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন হয় তার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে নানদের আত্মহত্যার ঘটনাও সাম্প্রতিক অতীতে ঘটেছে। পুস্তিকাটির প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে সেই সব অভিজ্ঞতার কথা — ১৯৫৭ সাল-এ চার্চের নেতৃত্বে কেরলে ব্যাপক আন্দোলন হয়। তার ফলে ১৯৫৯ সালে কেরলের নির্বাচিত সরকারের পতন হয়েছিল। এই বইটির প্রকাশ ও বিতরণের ফলে চার্চের মধ্যেই এক অন্তর্বিরোধ দেখা যাচ্ছে। মাত্র একমাস আগে ক্যাথলিক বিশপ কনফারেন্স চার্চকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল। কনফারেন্স-এর সভাপতি মেজর আর্চ বিশপ কার্ডিন্যাল ভারকে ভিটায়াথিল নিজেই কংগ্রেসের এক প্রার্থীকে মনোনয়নের জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে চার্চের পক্ষ থেকে বিশপ-এর কাছ থেকে যাজকদের কাছে চিঠিতে পাঠানো নির্দেশে বামপ্রার্থীদের পরাজিত করার কথা বলা হয়েছে। ত্রিচুরের আর্চবিশপ মার এ্যান্ড্রু থাজাথ এক চিঠিতে বলেছেন যে, কেরলের বিশেষ পরিস্থিতিতে এরকম একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

মোদ্দা কথা হল, এতদিন 'কেরল কংগ্রেস'কেই কেরলের খৃস্টানদের স্বার্থরক্ষাকারী দল বলে মনে করা হত। আর তাদের দলীয় নেতা ভায়লার রবি বিভিন্ন জোটের মন্ত্রী সভাতে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব করেছেন। কেরলে খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যা বেশ ভালো। এবার তারা সরাসরি চার্চের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন বামজোটের বিরোধিতা করলে দক্ষিণপন্থী প্রার্থীদের যে সুবিধা হবে সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

লোকসভা নির্বাচনে নির্দলদের ভূমিকা কমছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারতের রাজনীতির শুরু থেকে নির্দল প্রার্থীরা একটা ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছে। রাজনীতির পরিভাষায় দল বহির্ভূতকেই নির্দল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে গদির স্বার্থে বড় দলকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে নির্দল প্রার্থীরা তুলনাহীন। ইউপিএ, এনডিএ দুই জোটের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে নির্দল প্রার্থীরা রাজনীতির পাশার চালকে বদলে দিয়েছে। প্রার্থী নিজেই হর্তাকর্তা বিধাতা হওয়ায় রাজনীতির পুরোটাই হয়ে ওঠে ব্যক্তি কেন্দ্রিক। আদর্শ-নীতি ঠুনকো। ঝাড়খন্ডের মধু কোড়া দেশের প্রথম নির্দল মুখ্যমন্ত্রী। মধু কোড়ার সাফল্য থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় নির্দলের ভূমিকা এখনও মাঝে মাঝে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদিও একথা ঠিক, নির্দলদের গুরুত্ব ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বর্তমান। বিগত লোকসভা নির্বাচনগুলিতে নির্দলদের ভূমিকা ক্রমশ কমেছে।

সাধারণ নির্বাচন ২০০৯
লোকসভা নির্বাচনে নির্দলদের ঠিকুজী

সাল	মোট নির্দল প্রার্থী	নির্বাচিত প্রার্থী	জমানত বাজেয়াপ্ত (শতাংশের হিসাবে)
১৯৫২	৫৩৩	৩৭	৬৭.৫৪
১৯৫৭	৪৮১	৪২	৬৭.৩৬
১৯৬২	৪৭৯	২০	৭৪.৯১
১৯৬৭	৪৬৬	৩৫	৪৬.২৬
১৯৭১	১,১৩৪	১৪	৯৪.০০
১৯৭৭	১,২২৪	৯	৯৭.২২
১৯৮০	২,৪২৬	৮	৯৪.৪৭
১৯৮৪	৩,৭৯১	৫	৯৮.৭৯
১৯৮৯	৩,৭১২	১২	৯৮.৯২
১৯৯১	৫,৫১৪	৫	৯৯.৬৯
১৯৯৬	১০,৬৩৫	৯	৯৯.৭১
১৯৯৮	১,৯১৫	৬	৯৯.১১
১৯৯৯	১,৯৪৫	৬	৯৯.১৩
২০০৪	২,৩৮৫	৫	৯৯.৩৭

তথ্য ঃ কে বি কে, পোলগ্রাফিক-এর সৌজন্যে

সাত সামুরাইয়ের কাহিনী

চন্দন মিত্র

ঠিক দু'মাসের মধ্যে আমাদের দেশের সাত সামুরাইয়ের ভাগ্য নির্দ্ধারণ হয়ে যাবে। আগামী কয়েক বছরের জন্য তারা কী আশাদীপ জ্বালিয়ে রাখবে না কি এদের ভাগ্য চিরতরের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। আজকাল এরা বেশ মুশকিলে পড়ে গেছে। যুদ্ধের গেমপ্ল্যান কী হবে বা যুদ্ধ পরিচালনায় কী নীতি নিয়ে চলা হবে — এমনই সব জল্পনা-কল্পনায় এরা চিন্তিত। দৃশ্যতঃ এদের ললাটে চিন্তার ভাঁজ। এদের মধ্যে কাউকে বড় শরিক কেটে ছেঁটে দিচ্ছে, আবার কেউ বা পরিবারের জ্যেষ্ঠকে বাদ দিচ্ছে। কেউ বা আবার ভাবছে ভারতের ইতিহাসে নিজের জায়গা চিহ্নিত করার জন্য দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সামনে এটাই শেষ সুযোগ। আবার অনেকে যারা আজকের রাজনৈতিক আবহে ব্রাত্য, তারাই এখন একজোট হয়ে নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকতে সচেষ্ট।

যেমন ধরা যাক, এদেরই দুই প্রভাবশালী নেতার কথা। শারদ পাওয়ার এবং মুলায়ম সিং যাদব— এঁরা দুজনেই শাসক গোষ্ঠীর শরিক এবং প্রথমজন আবার মহারাষ্ট্রে রাজত্ব চালাচ্ছেন কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে। সম্প্রতি কর্ণাটকের টুমকুরে থার্ড ফ্রন্টের যে বহু চর্চিত সমাবেশ হল তাতে এই দু'জন ছিলেন গরহাজির। আধুনিক রাজনীতির গুরু এইচ ডি দেবেগৌড়া এক ফ্লপ শো অনুষ্ঠিত করেছিলেন টুমকুরে। নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন অন্য সামুরাইরা যেখানে তিনি নিজেকে ও তাঁর পুত্রকে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নেতা ঘোষণা করলেন।

দুই ভদ্রমহিলা নিজেরা ফ্লপ শো-তে সামিল না হয়ে, নিজ নিজ প্রতিনিধি পাঠালেন নৈশভোজে। আরেক দক্ষিণী সুপ্রিমো গরহাজির, কেননা তিনি চেন্নাইয়ে সরকার চালাচ্ছেন কংগ্রেসের দোসর হয়ে। এই সাত সামুরাইয়ের মধ্যে মাত্র দু'জন —একজন হলেন অন্ধ্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এবং অপরজন ঘোলাজলে মাছ ধরায় অভ্যস্ত কম্যুনিস্ট, যিনি এক কাল্পনিক জোট গড়ার লক্ষ্যে সচেষ্ট।

আর শারদ পাওয়ার যিনি সব সময়ে চেষ্টা চালাচ্ছেন বর্তমান জোটকে বানচাল করে নতুন এক জোট গড়ে তাঁর পরবর্তী ঠিকানা নিয়ে যেতে চান রেস কোর্স রোডের সরকারি বাসভবনে। এটাই হবে তাঁর শেষ প্রচেষ্টা।

১৯৯১ সালে এমন এক সোনালী সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। পাওয়ার মনে করেন তাঁরই প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত। কেননা তিনি বহুদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নতুন কেন্দ্র মাঠায় এমন অনেক নয়া ভোটার আছে, যাদের অনেকেই জন্মায়নি যখন থেকে পাওয়ার লড়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য। তাছাড়া তিনি চান মহারাষ্ট্রের শাসনের

মায়াবতী

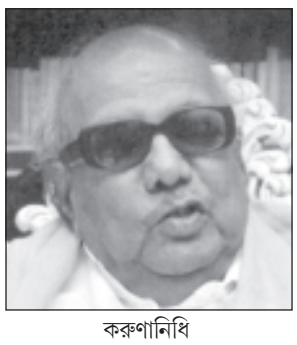

করুণানিধি

চাবিকাঠি তাঁর ৩৯ বছর বয়সী দুহিতা সুপ্রিয়া সালের হাতে তুলে দিতে। এই পালা বদল সম্ভব হবে যদি 'মারাঠা বড়দা' দিল্লীতে গিয়ে কামান দাগেন।

একইভাবে মুলায়ম নরম-গরম খেলা খেলছেন। তিনি উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীকে কংগ্রেসী সহায়তায় পরাস্ত করতে চান। আবার সোনিয়াজীর সমর্থনে কেন্দ্রে এমন সংখ্যায় আসতে পারেন যাতে সেখানে প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবিদার তিনিই হবেন। কারণ উত্তরপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যের তিনি এক রাজনৈতিক দলের নেতা।

তামিলনাড়ুর দৃশ্যটা জটিল। ডি এমকে এবং এ ডি এমকে দুই দলই অতীতে পরস্পর বিরোধী দুই জোটে সামিল হয়েছে আবার বেরিয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ডি এম কে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীত্ব বজায়

মুলায়ম সিং

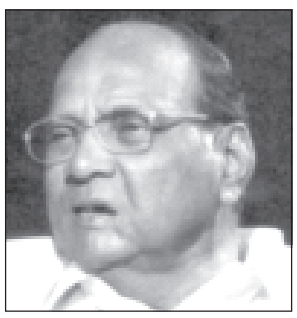

শারদ পাওয়ার

চন্দ্রবাবু নাইডু

রেখে চলেছে। রাজা বালুরা একবার এন ডি এ, আরেকবার ইউ পি এ-তে থেকে গেছেন এবং এরপর তাঁদের মূল্য যদি বাড়ে তো তাঁরা যেকোনও জোটেই সামিল হতে রাজি।

করুণানিধি মনে করেন আঞ্চলিক দলগুলি যদি প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে সামিল হতে পারে তবে তাঁর পুত্র নয় কেন?

আবার করুণানিধির চিরশত্রু জয়ললিতার মধ্যে কোনও ঢাক ঢাক গুর গুর নেই। তিনি আবার উচ্চাভিলাষী। যদি এ ডি এমকে জোট তামিলনাড়ুতে ৩০ টা আসন পায়, মুলায়ম-মায়াবতীকে পিছনে ফেলতে তিনি আরও বেশি তৎপর হবেন প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড় প্রতিযোগিতায়।

প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্রে চন্দ্রবাবুর পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে

নবীন পট্টনায়েক

জয়ললিতা

কংগ্রেসকে হটানো মুশকিল। কারণ সেখানে দেশের মধ্যে সবচেয়ে মজবুত অবস্থায় রয়েছে কংগ্রেস। চন্দ্রবাবু ভাবছেন যদি তিনি একবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান, তবে মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই রাজশেখর রেড্ডি কে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন। কিন্তু এক জায়গায় বা এক জোটে উনি বেশিদিন থাকতে পারেন না। তিনিই তৎকালীন থার্ড (ইউনাইটেড) ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৯৮-তে অবলীলায় এন ডি এ-তে যোগ দেন। আবার ২০০৪-এ এন ডি এ ছেড়েও দেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ২০০৪ সালে বাজপেয়ীকে নির্বাচন এগিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এরই মাঝে সম্প্রতি মায়াবতী ৪৮ ঘন্টার সময় সীমা বেঁধে দিয়েছেন — দ্বন্দ্ব জীর্ণ থার্ড ফ্রন্টকে তাঁকে নেতা হিসেবে নির্বাচিত করার। স্বাভাবিকভাবে বাকি ছয় সামুরাই তাঁর আবদারের কাছে নতজানু হবেন না, কেননা তাঁরাও উচ্চাভিলাষী। কিন্তু মায়াবতীর থার্ড ফ্রন্টে থাকার অর্থ হল মুলায়ম সেখানে নেই। যদি ইউপি-তে ৪০টি আসন কোনওমতে মায়াবতী পেয়ে যান, তবে ইউপিএ বা এন ডি এ-র সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীর জন্য তিনিই প্রথম দাবিদার।

আশা যাক নবীন পট্টনায়কের কথায়। ইনি আবার নিজের জনপ্রিয়তা নিয়ে এতটাই গর্বিত যে, শেষমেশ একেবারে ভোটের মুখে বিজেপি'র সঙ্গ ছাড়লেন। এঁকে অনেকেই বোঝাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে তিনিই 'কালো ঘোড়া'। কারণ তিনি অন্য সামুরাইদের থেকে কম বিতর্কিত, কম কলঙ্কিত এবং ইউপিএ-এনডিএ জোটের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তাঁরই সবচেয়ে বেশী। আবার তিনি যদি কোনও মতে ১৫টি আসন পেয়ে যান তবে তো কথাই নেই। তবে তো দুই জোটের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যাবে — এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ।

পরিশেষে সি পি এমের কট্টর সাধারণ সচিব যিনি তাঁর হতাশাগ্রস্ত কমরেডদের আশার আলো দেখাতে চান — এই তৃতীয় ফ্রন্টের মাধ্যমে। পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকা পালন করতে চাইছেন তিনি। কর্ণাটকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হবার পর, আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি তৃণমূলের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই অবস্থায় সপ্তম সামুরাইয়ের প্রত্যেকেই তৃতীয় ফ্রন্টের নায়ক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইছেন দলীয় সার্বিক ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিতে।

আমরা যেভাবেই বিষয়টাকে দেখি না কেন, এবারে একটা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে এবং এইভাবে নেতা-নেত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভোটদাতাদের সচেতনভাবে তাদের নেতা নির্বাচন করতে হবে। এইসব সামুরাইরা ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগলযুগের মনসবদারদের সঙ্গে তুলনীয়, যারা দিল্লীর দরবার দখল করতে হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছিল। এমন অবস্থা রুখতে না পারলে আমরা বহু নিন্দিত মহম্মদ শাহ রঙ্গীলার 'দিল্লী দূর অস্ত' নামের কুখ্যাত নাটকের অংশীদার হব।

(লেখক 'দি পায়োনীয়র'-এর সম্পাদক)

একনজরে গত দু'টি সাধারণ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের পারফরম্যান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। লোকসভায় মহিলা বিল উত্থাপন নিয়ে বছরের পর বছর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চাপানউতোর লেগেই রয়েছে। যেন মহিলা সংরক্ষণ বিল উত্থাপন হলেই মহিলাদের যাবতীয় দুঃখ, সব প্রতিকূলতার অবসান হবে। কিন্তু ভোট এলে প্রার্থীপদ ঘোষণা নিয়ে বিস্তর মাথাব্যথা রাজনৈতিক দলগুলির। মহিলাদের নিয়ে বড়বড় কথা বলা দলগুলির মহিলা প্রার্থী দাঁড় করানো নিয়েই যত টালবাহানা। দেশের গত দু'টি সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকালে অবশ্য দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালের তুলনায় ২০০৪ সালে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচনে জিতে আসা প্রার্থীর সংখ্যা অনেকটাই কম। শুধু তাই নয়, জাতীয় দলগুলির ক্ষেত্রেও নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী দাঁড় করানোর হারও অনেকটাই হতাশাজনক। নীচে গত ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালের দেশের সাধারণ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনী ফলাফল বর্ণনা করা হল (সারণী দেখুন)।

সাধারণ নির্বাচন - ১৯৯৯

দল	আসন			শতকরা হার		বৈধ ভোট
	প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে	জয়ী	জামানত বাজেয়াপ্ত	জয়ী	জামানত বাজেয়াপ্ত	
১. বিজেপি	২৫	১৫	১	৬০.০০	৪.০০	৬৮৬৮৩৫৫
২. বিএসপি	১১	১	৯	৯.০৯	৮১.৮২	৬৪৮১৫৮
৩. সিপিআই	৪	১	৩	২৫.০০	৭৫.০০	৪৬১০৬৮
৪. সিপিএম	৫	৩	২	৬০.০০	৪০.০০	১৩১৮৮৩৪
৫. জাতীয় কংগ্রেস	৫১	১৪	১৩	২৭.৪৫	২৫.৪৯	১০৮২৩৪৬১
৬. জেডি (এস)	৫	০	৫	০.০০	১০০.০০	১১৪৫৭৭
৭. জেডি (ইউ)	৩	১	২	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	৩৬৪৪৯৮
জাতীয় দল	১০৪	৩৫	৩৫	৩৩.৬৫	৩৩.৬৫	২০৫৯৮৯৫১
রাজ্যদল	৫৫	১৩	২৬	২৩.৬৪	৪৭.২৭	৮৭২৩৫৬০
রেজিস্ট্রিকৃত দল	৪৭	০	৪৬	----	৯৭.৮৭	৬৯৩৮৪২
নির্দল	৭৮	১	৭৬	১.২৮	৯৭.৪৪	৮১৯৪৪১
মোট	২৮৪	৪৯	১৮৩	১৭.২৫	৬৪.৪৪	৮১৫২৬৪১

সাধারণ নির্বাচন - ২০০৪

দল	আসন			শতকরা হার		বৈধ ভোট
	প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে	জয়ী	জামানত বাজেয়াপ্ত	জয়ী	জামানত বাজেয়াপ্ত	
১. বিজেপি	৩০	১০	৩	৩৩.৩৩	১০.০০	৬৯৪০৮৮৪
২. বিএসপি	২০	১	১৬	৫.০০	৮০.০০	১০৮১৮৪৩
৩. সিপিআই	২	--	১	---	৫০.০০	২৯২৮৬৬
৪. সিপিএম	৮	৫	১	৬২.৫০	১২.৫০	২৭৩০৬৭৮
৫. জাতীয় কংগ্রেস	৪৫	১২	৫	২৬.৬৭	১১.১১	১৯২২০৯৮
৬. এনসিপি	৫	২	৩	৪০.০০	৬০.০০	৭৮৭০৫১
জাতীয় দল	১১০	৩০	২৯	২৭.২৭	২৬.৩৬	২৩৭৫৫৪২০
রাজ্যদল	৬৬	১৪	৩৩	২১.২১	৫০.০০	১০২৪১০৪৭
রেজিস্ট্রিকৃত দল	৬২	১	৬০	১.৬১	৯৬.৭৭	৯২৮৬১৬
নির্দল	১১৭	-	১১৭	-	১০০.০০	৭৪৪৯০৮
মোট	৩৫৫	৪৫	২৩৯	১২.৬৮	৬৭.৩২	৩৫৬৬৯৯৯১

বরুণ গান্ধীর ওপর রোমানীয় প্রতিশোধ

তরুণ বিজয়

বিচারের নীতিকে তোয়াক্কা না করেই নির্বাচন কমিশন তাড়াতাড়িই শাস্তির খাড়া আমার ওপর নামিয়ে দিল। এক পত্রে নির্বাচন কমিশনকে এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন বরুণ ফিরোজ গান্ধী। সঞ্জয় পুত্র বরুণের বক্তব্য ছিল এরকম —

(ক) বিচারের নিয়ম অনুসারে আমার বক্তব্য পেশ করার অধিকার আছে এবং সেই অধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করুন।

(খ) ১৭ মার্চ ২০০৯-এর যে রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার প্রতিলিপি আমাকে দেওয়া হোক।

(গ) যদি আমার বক্তব্যের আদৌ কোনও রেকর্ডিং থাকে তার একটা কপি বা নকল আমাকে দেওয়া হোক।

(ঘ) টেপের বৈধতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আপনার কাছে টেপের যে প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে তাতে বক্তব্যকে অন্যায়ভাবে বিকৃত করা হয়েছে এবং যেভাবে টেপকে এডিটিং করা হয়েছে তাতে আমার বক্তব্যকে শুধু বিকৃত নয়, মিডিয়া দ্বারা ভিডিও ফুটেজের সঙ্গে টেপের বিবৃতির মিল নেই।

(ঙ) নিজের মতো করে ব্যাখ্যা এবং বিষয়বস্তুকে বিকৃত করে উত্থাপনকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

যারা অযোধ্যা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে তারাই আবার কাশ্মীরি হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারে চুপ, এরাই আবার নীরব রামসেতু ধ্বংসের বিষয়ে, এরা অস্বীকার করে রামের অস্তিত্বকে। যারা গোধরা ঘটনাকে অস্বীকার করে তারাই আবার ১৯৮৪-র শিখ দাঙ্গার পৃষ্ঠপোষক — এমন সব ব্যক্তিরাই বরুণ গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন শেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। মিডিয়া এমনভাবে এক আবহাওয়া তৈরি করেছে যেন বরুণ গান্ধীকে সমর্থন করা অন্যায়,পাপ। কিন্তু কেন? কারণ খুব সহজ। তা হল এই যে, নেহেরু গান্ধী রাজনৈতিক ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে ওই ঘরানার এক তরুণ তাঁর অন্তরাত্মার কথা অকপটে বলেছেন।

বরুণ কী বলেছেন বা বলেননি ব্যাপারটা সেইরকম নয়। বরং গান্ধী ঐতিহ্যকে আঘাত করেছেন ওই ঘরানারই এক তরুণ, যিনি এদের মতে গেরুয়া ব্রিগেডের কাছে বিকিয়ে গেছে। এমন ঘটনাই হিন্দু বিরোধী মিডিয়াকে উজ্জীবিত করেছে বরুণের বিরুদ্ধে তোপ দাগার, কুৎসা রটনার। তাঁর বক্তব্য শোনা হয়নি, তাঁকে তাঁর মতো করে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি, তাঁর বক্তব্যের সিডি-র কোনও ফরেনসিক পরীক্ষা না করেই এ যুগের বাদশা তার ফরমান জারি করেছে একতরফাভাবে। এমনটাই এযুগের বিচার।

নেহরু পরিবারের কাউকেই এযাবৎ বলতে শোনা যায়নি যে সে হিন্দু। বরং তারা ভিন্ন কথাই বলেছে। এই পরিবারের লোকেরা হিন্দু সংগঠনকে বে-আইনি ঘোষণা করেছে, এরাই দেশে জরুরী অবস্থা জারি করে মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে, এরাই বিচার ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার চেষ্টা করেছে। বিচারপতিদের অপমান করেছে। এরাই আবার শিখ দাঙ্গার অভিযুক্তদের আড়াল করেছে। পুরস্কৃত করেছে কুখ্যাত অপরাধীদের। তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতিয়েছে এরা, যারা খুনের অপরাধে অভিযুক্ত এবং নানান সঙ্গে জড়িত, নইলে কী এরা ভারত বিভাগের পর ভারত ভাগের দায়ে দায়ী মুসলিম লীগের সঙ্গে সখ্যতা করে? পরিহাসের বিষয় হল, এরাই আজকে সুন্দর, শান্তির ধবজাধারী, স্বদেশপ্রেমী ডেমোক্র্যাট যারা আবার গীতা পড়ার উপদেশ দেয়।

সাতচল্লিশ সালে আমাদের সেনারা যখন সীমান্তে পাক হানাদারদের মোকাবিলা করছে তখন তাদের কাছে পর্যাপ্ত জীপ ছিল না। তখন বৃটিশ সরবরাহকারী কোম্পানীকে সত্বর জীপ পাঠানোর বরাত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এক বছর বাদে যখন জীপ এলো তখন যুদ্ধ শেষ, যা হবার তা হয়ে গেছে। বৃটিশ কোম্পানীর কাছে বরাত সেই সময়ে পাঠানো হয়েছিল নেহেরুর প্রিয় পাত্র তৎকালীন হাই কমিশনার কৃষ্ণমেননের মাধ্যমে। স্বাধীন ভারতে সেই প্রথম দুর্নীতির শুরু ঘুষ কাণ্ডের মাধ্যমে। আমরা হারলাম সেই যুদ্ধে গিলগিট, বালুচিস্তান, স্কার্দুর মতো অঞ্চল। আমরা হারলাম আকসাই চীন, কারণ তৎকালীন দিল্লীর সরকার আমাদের দেশের সীমানার রূপ রেখা জানত না, ফলে সেনা টহলের ব্যবস্থা হয়নি।

সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস শাসনে আমরা পাকিস্তান ও চীনের কাছে হারলাম দেশের

বরুণ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এটাওয়া জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন রাজনাথ সিং।

এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল এবং ১৯৬২-তে আমরা এক মিথ্যা স্বপ্নের সাক্ষী হলাম।

সেই সময়ে আমাদের অস্ত্র নির্মাণ কারখানায় তৈরি হত কফি মেশিন। পণ্ডিত নেহেরু সেই সময়ে দেশের এক প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করতেন প্রকাশ্যেই। বলতেন, 'কে আমাদের আক্রমণ করবে'?

মানুষ আজও মনে করে ডঃ শ্যামপ্রসাদের হত্যা রহস্যের কথা। তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, কেননা তিনি চেয়েছিলেন কাশ্মীরও বিহার বাংলার মতো দেশেরই অঙ্গ এবং সেখানে প্রবেশের জন্য পারমিট রাজের খতম দরকার। সেই সময়ে কাশ্মীরে দুই শাসক ছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হত সদর-ই-রিয়াসত। দুই প্রধান, দুই নিশান, দুই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুই নেহেরুকে বাধ্য করে পারমিট রাজ খতম করতে। এরপর একের পর এক ঘটেছে ঘটনা। সামনে এলো মুন্দ্রা দুর্নীতি, নাগরওয়ালা মামলা, এল এন মিশ্র হত্যাকান্ড, তৎকালীন জনসংঘের নেতা দীনদয়াল হত্যাকাণ্ড। একজন কংগ্রেস নেতা খোলাখুলি দল সমর্থিত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল এক প্রার্থী দাঁড় করালেন। 'জোড়া বলদ' ছিল পূর্বতন কংগ্রেসের প্রতীক। কংগ্রেস ভাগ হল। প্রতীক চিহ্ন হল 'হাত' এবং বলা হল বিবাদ নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি 'হাত' চিহ্নই অস্থায়ীভাবে থাকবে। কিন্তু আজও তা নিষ্পত্তি হল না।

আচমকা সোনিয়ার উত্থানের বিরোধিতা করেছেন সাংমা, পাওয়ারের মতো নেতারা তাঁর বিজাতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে। পুরোনো কংগ্রেসীরা আজও স্মরণ করে রাজেশ পাইলট, মাধব রাও সিন্ধিয়া, জিতেন্দ্র প্রসাদের মতো নেতাদের। যাঁরা কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে পরিচালনা করতে পারতেন। পুরনো বরিষ্ঠ কংগ্রেসী সীতারাম কেশরীকে জীবন সায়াহ্নে কম হেনস্থা হতে হয়নি। পরিবারের বাইরে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি পুরো ৫ বছর সরকার চালালেন, মৃত্যুর পরও তাঁকে অপদস্থ হতে হয়েছে। তাঁর মরদেহ দিল্লীর মূল কংগ্রেস কার্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁরই রাজ্যে তাঁর নামে বিমানবন্দরের নামকরণ করা হোক — বিরোধী নেতার এমন প্রস্তাব নাকচ করে দেন দলেরই মুখ্য প্রশাসক। এইভাবেই কংগ্রেস পরিবারের বাইরের নেতাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এরাই নিজেদের স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করেছে, বিকৃত করেছে, অপদস্থ করেছে সংবিধানকে। এরাই বিরোধী রাজনীতিকে টুঁটি টিপে মারার চেষ্টা করেছে। বিরোধী নেতাদের ধর পাকড় করে অজ্ঞাতস্থানে পাঠিয়েছে।

তবুও এরা গণতন্ত্রের ধবজাধারী, এরাই আবার অ-সাম্প্রদায়িক, বাক্ স্বাধীনতার ধারক-বাহক হিসেবে পরিচিত।

এরা সুপরিকল্পিতভাবে গত ষাট বছরে দেশকে পিছিয়ে রেখেছে। এখানে আজ অবধি দেশের রাজধানীতে সুবৃহৎ বিমানবন্দর হল না। দেশে আজও এক বছরে সত্তর হাজার গরীব কৃষককেআত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। আজ সাহসী বীর সেনানীর মরণোত্তর সম্মান পদক ফেরৎ দেন তার নিকট আত্মীয়রা প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবে। পরিহাস হল স্লামডগ মিলিয়োনীয়ার-এর মতো চলচ্চিত্র ২০০৯ সালের অস্কার সম্মানে ভূষিত হল — স্রেফ বিশ্ব দরবারের ভারতকে গরীব দেশ হিসেবে চিহ্নিত করাতে। আমরা ভোটের লক্ষ্যে বে-আইনি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ভালবাসি। তাদের নাগরিকত্ব দিই। কারণ এরাই নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বিদেশীদের তাড়িয়েছিল।

নির্বাচনী সংস্কার নেই, নেই পুলিশ সংস্কার, এদের উৎসাহিত করা হয়নি, এদের অস্ত্রের মান বাড়ানো হয়নি, তবুও আমাদের সেনানীরা ১৯৭১ সালে যুদ্ধ জয়ে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গত ছয় দশকে কংগ্রেসী শাসনে মাইনরিটির নামে মুসলিম তোষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এরা এদের উন্নয়ণে অবলম্বন চায় সরকারের কাছে। 'ল' বোর্ডের ধাক্কায় নয়া ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে এদের উন্নয়ণে যা কিছু হচ্ছে, তাতে সংখ্যাগুরুদের উন্নয়ণে পরিষেবা, ব্যয় সংকুচিত।

এরা সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানছে, উৎসাহিত করছে তাদের যারা গত বারশ বছর ধরে এই হিন্দুদের নিষ্পেষণ করে এসেছে। খন্ডিত স্বাধীনতা লাভের পর এই হিন্দুদের পাওয়া

(এরপর ১২ পাতায়)

এক নজরে লোকসভার সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। লোকসভা নির্বাচনে এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন বিদায়ী চতুর্দশ লোকসভাতেই। ১৯৯৯ সালের ত্রয়োদশ লোকসভায় ১৪৫ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সাংসদ ছিলেন। এ ছাড়া চলতি চতুর্দশ লোকসভায় গ্র্যাজুয়েট সাংসদের সংখ্যাও অর্ধেক নয়। ২৪৯ জন গ্র্যাজুয়েট সাংসদ রয়েছেন। ভারতের মতো বিশ্বের অন্যতম জনবহুল, গরীব দেশে এমন সাংসদও রয়েছেন যাদের অক্ষরের জ্ঞান নেই। অথচ সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। এমনকী মানুষকে বোঝানোর বিষয়ে এদের জুড়ি মেলা ভার।

চলতি চতুর্দশ লোকসভায় এই রকম সাংসদের সংখ্যা ১৯ জন। তেমনি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা ম্যাট্রিকুলেশন এমন সাংসদের সংখ্যা চতুর্দশ লোকসভায় রয়েছে ৯৬ জন। পি এইচ ডি ধারী সাংসদ রয়েছেন ২২ জন। যদিও ১৯৯৯ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ২৭ জন। এ যাবৎ একাদশ লোকসভাতেডক্টরেট সাংসদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মোট ২৯ জন সাংসদ ছিলেন সে সময় ডক্টরেট ডিগ্রিধারী।

নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হল প্রথম লোকসভা থেকে এ পর্যন্ত সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম	একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ	চতুর্দশ
শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই কিন্তু জনগণকে বোঝাতে পারেন	১১২	১২০	১৪১	৫৪	১১৯	৫২	৫৩	৪২	১০	১৮	১৫	১২	১৫	১৯
মেট্রিকুলেশন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট	৮৮	৯০	৮৭	১০১	৮২	১৩২	১১৮	১১২	৯৪	১০১	১০২	১০৭	৯০	৯৬
গ্র্যাজুয়েট	১৭৭	১৬০	১৫৭	১৭২	১৭৮	২০৫	২১৩	২৩৮	২৩৩	২২০	২২২	২৩৭	২৫৬	২৪৯
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট	৮৫	৯২	৯৮	১১৩	১২৭	১৩২	১৩৬	১৩১	১২৪	১৪৫	১৪৯	১৪৯	১৪৫	১৫৭
ডক্টরেট	১৫	৯	৭	১৭	৮	৯	৮	১০	১৭	২০	২৯	২৪	২৭	২২

মজবুত নেতা, নির্ণায়ক সরকার

অধ্যাপক আশিস রায়

পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা আসরে নেমে পড়েছেন। কেন্দ্রে কোনও রাজনৈতিক দলের সরকার হবে নাকি জোট সরকার হবে, এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বিচার বিশ্লেষণ করছেন। তবে একথা ঠিক যে এবারেও কেন্দ্রে কোনও একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না। কি হবে — ইউ পি এ সরকার বা এন ডি এ সরকার অথবা তৃতীয় ফ্রন্ট সরকার তার উত্তর জনগণের রায় নির্ধারণ করবে। বিগত চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের পর (২০০৪) কেন্দ্রে যাতে বি জে পি সরকার গড়তে না পারে সেজন্য বামপন্থীরা (বিশেষত সি পি এম, সি পি আই) তাদের নীতি ও মতাদর্শ বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস- (ই) দলের সরকারকে (ইউ পি এ) সমর্থন জানায়। চার বছর কংগ্রেসের সাথে মধুচন্দ্রিমার পর হঠাৎ বামপন্থীরা পরমাণু চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় ইউ পি এ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, কৃষকের আত্মহত্যা প্রভৃতি প্রশ্নে বামপন্থীরা সরব হলেন না, প্রতিবাদ করলেন না। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেন, এমনকী পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও বামপন্থীরা আন্দোলন করলেন না। তারা নাকি কৃষক-শ্রমিক, শিক্ষক, গরীব মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করে? বাস্তবে দেখা যায় যে বামপন্থীরা দিল্লীতে কংগ্রেসের সঙ্গে দোস্তি, আর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে 'কুস্তি'। এ রাজনীতি বেশি দিন চলে না। এবার মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তার জবাব দেবে। কংগ্রেস (ই) দল হল সি পি আই (এম) এর "বি" টিম। কংগ্রেস (ই) দলের নিজস্ব কোনও নীতি নেই — সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী দল। অন্যদিকে সি পি আই (এম) হল ধান্দাবাজ ও ভোগবাদী দল। দেশের জনগণের উন্নতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের দিকে বেশি নজর দেয়। অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর নেতৃত্বে এন ডি এ সরকারের আমলে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ণ ঘটেছে, পরবর্তীকালে ইউ পি এ

সরকারের আমলে উন্নয়ণের সেই গতি থেমে গেছে, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমিকতা বিপন্ন হয়েছে। ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ মুম্বাই-এ পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীরা যে আক্রমণ পূর্ব-পরিকল্পিত ভাবে চালিয়েছিল তাতে বহু নিরীহ মানুষ হতাহত হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারের কাছে আগের থেকে সংবাদ থাকা সত্ত্বেও কোনও সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা হলেন ইউ পি এ সরকার অর্থাৎ কংগ্রেস (ই) এবং সি পি আই (এম)। এরা মুসলিম তোষণকারী দল। এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের তুলনায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদের তোষণ করে। মুসলিমদের জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য খাতে অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে এবং অধিক সুযোগ সুবিধা দেয়। অথচ ভারতে বর্তমানে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগের বেশি হিন্দু। তাদের জন্য কোনও প্যাকেজ নেই, তারা নিগৃহীত, আক্রান্ত হলে কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। বি জে পি একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা মুসলিম তোষণের বিরোধী। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেছিলেন — "Justice to All, Appeasement to none"। যারা বি জে পি-কে সাম্প্রদায়িক দল বলে চিহ্নিত করে তারা নিজেরাই সাম্প্রদায়িক দল, কারণ তারা মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, তারা মুসলিম তোষণকারী দল। দেশকে বাঁচাতে গেলে, দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে হলে, উন্নয়ণের গতিকে

(এরপর ১৩ পাতায়)

পাঠকের মতামত

বরুণ গান্ধীর বিপক্ষে কেন?

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদে প্রকাশ মানেকা তনয় বরুণ গান্ধী সম্প্রতি পিলভিটে তাঁর লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রে এক জনসভায় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, হিন্দুদের আঘাত করলে হাত কেটে নেওয়া হবে, দাড়ি উপড়ে ফেলা হবে। এই সাংঘাতিক মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদ মাধ্যমগুলি। ইতিমধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন, কতটা সমীচীন হয়েছে এই মন্তব্য। সংখ্যালঘু তথা মুসলমানরা এক সময় ভারতের শাসক ছিল। সাতশো বছর ধরে তারা এদেশ শাসন করেছে। তারপর ইংরেজরা এদেশে এসে মুসলমানদের হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নিলে তারা নখদন্তহীন বাঘে পরিণত হয়েছে। তবে তারা সংগঠিত হচ্ছে, শক্তি সঞ্চয় করছে। আরব দেশগুলি থেকে কোটি কোটি পেট্রোডলার এদেশে আসছে। সে টাকায়, এদেশে হাজার হাজার মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব তৈরি হচ্ছে। তবে ওই পেট্রোডলারের একটা বৃহৎ অংশ দেওয়া হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমগুলিকে আর ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে। তাই সংবাদমাধ্যমগুলি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ প্রচার করে না, বরং চেষ্টা করে তাদের অপরাধগুলি খাটো করে দেখানোর। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও পেট্রোডলারে পুষ্ট হয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে মুসলমানরা সব 'গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসীপাতা।" যত দোষ সব ওই হিন্দু ব্যাটাদের। গুজরাটের গোধরায় সবরমতি

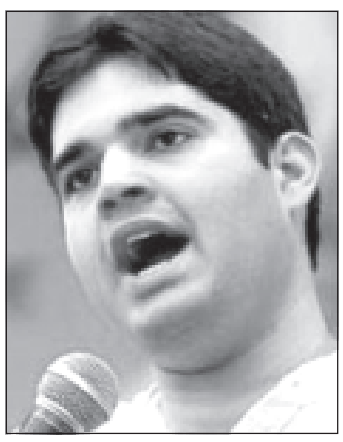

এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় হিন্দুরাই অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে হিন্দুদের হত্যা করেছিল। ২০০৬ সালে মুম্বাইতে ৭টি ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল হিন্দুরাই। প্রচার করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন সিং এবং আস্তুলে। পশ্চিমবঙ্গের মমতাজ বানু কয়েক হাজার ক্যাডার নিয়োগ করেছেন, দান খয়রাত করছেন আরবের টাকায়। তাই তিনি রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুতে শোকাপ্লুত হলেও, মুর্শিদাবাদে শৈলেন্দ্র প্রসাদকে মুসলিম কন্যা বিবাহ করার অপরাধে মুন্ডু কেটে হত্যা করা হলে বা বারাসাতের অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুসলিম কন্যা বিবাহ করার অপরাধে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হলে এতটুকু বিবেকের দংশন অনুভব করেন না; যদিও রিজওয়ানুর রহমান-এর মা কয়সর জাহানকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবিসর্জন করতে কার্পণ্য করেন না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তসলিমা নাসরিনকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু অবাঙ্গালি উর্দুভাষী মওলানা মওলভীর প্ররোচনায় মধ্য কলকাতার এন্টালী, রিপন স্ট্রীট, মল্লিক বাজার চার নম্বর ব্রীজ প্রভৃতি এলাকায় যখন ব্যাপক ভাঙচুর করা হল, ৮।১০ টি গাড়ি পোড়ানো হল, পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছোঁড়া হল তখন তিনি সম্পূর্ণ মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। তবে সম্ভবতঃ সৈয়দ মহম্মদ নরুর বরকতি বহমনের নির্দেশেই তিনি বলেছিলেন, তসলিমা কলকাতায় থাকলে যদি অশান্তি হয়, তাহলে তাঁর কলকাতা থেকে চলে যাওয়াই উচিৎ। অর্থাৎ কতগুলি উর্দুভাষী অবাঙ্গালি মওলানা মওলভীর হুমকির কাছে মাথা নত করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তসলিমাকে

(এরপর ১৩ পাতায়)

তখতের লোভে মমতার ডিগবাজী

কৃষ্ণচন্দ্র দে

নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে। চারিদিক সাজসাজ রব। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম প্রশাসনকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়ে বিরোধীদের পালে কিঞ্চিৎ হাওয়া তুলে দিয়েছে। এই দুটো গ্রামকে মূলধন করেই অগ্নিকন্যা তার অভীষ্ট পূরণে তৎপর হয়ে নির্বাচনী যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে বসে আছেন তাদেরকে সঙ্গী করেই যাদেরকে একদিন সিপিএমের 'বি টিম' বলে আক্রমণ শানিয়েছিলেন মুহুর্মুহু। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসকে তরমুজ বলে গালি দিতেও যার কখনও বাঁধেনি। প্রতিনিয়ত কঠিন কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে যিনি কদাচ কসুর করেননি, সেই পটুয়াপাড়ার অগ্নিকন্যা কোন স্বপ্নে বিভোর হয়ে সেই কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী তরী পার হতে মনস্থির করে ফেললেন তা আমি তো কোন ছার শিবেরও অগোচর। একটু পশ্চাদ্‌পট ঘেটে বহু পুরানো ঘটনার প্রতি কিছু আলোকপাত করে দেখা যাক।

কংগ্রেস থেকে একরকম বিতাড়িত হয়ে যিনি কয়েকজনকে সঙ্গী করে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করে ভারতীয় জনতা পার্টির জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে অটলবিহারীর হাত ধরে এন ডি এ-তে সামিল হলেন এবং তার পছন্দমতো রেলদপ্তর হাসিল করে রেলমন্ত্রী হয়ে বসলেন। এ প্রসঙ্গে অটলজীর স্নেহধন্যা বা কিঞ্চিৎ দুর্বলতার কথা এসেই পড়ে। যেমন এককালে আদবানীজীকে ও দেখেছি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই নামটার প্রতি কেমন যেন দুর্বলতা রোগে ভুগতেন। বাড়িতে না গিয়ে তার আদরের কন্যার বাড়িতে মধাহ্ন-ভোজ করতেন। এমনকী তার মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও তিনি কোনওরকম কুণ্ঠাবোধ করেননি, এমনভাবে তোল্লাই দিয়েও ঘনঘন পদত্যাগ বিরত রাখতে পারেননি। প্রতিনিয়ত তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বিব্রত করতে কোনও রকম লজ্জাবোধ করেননি। পদত্যাগে তিনি তো একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। অলিম্পিকে কোনও পদক থাকলে নির্ঘাত তার জন্য তা বাধা হয়ে থাকতো। আটটা সিট-এর কল্যাণে তিনি কি ধরা কে সরা জ্ঞান করেননি? এমন কি পশ্চিমবঙ্গে কে কে মন্ত্রী হবেন তাও তিনি নিজে মাতববরি করতেন এবং নুন থেকে চুন খসলেই সেই পদত্যাগের হুমকি। জর্জ ফার্নান্ডেজ-এর ব্যাপারে হঠাৎ পদত্যাগ করে অটলজীকে ব্যতিব্যস্ত করতে দ্বিধা তো করলেনই না, অহরহ কঠিন কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থাকলেন। এই রকম একটা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে এতটা পাত্তা দিয়ে বিজেপি-র কি লাভ হল। লাভ যার হয়েছে তারই হয়েছে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোটে থেকে যতটা মধু আহরণ করার দরকার ছিল, তা পুরো মাত্রায় শুষে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার অন্য তীরে তরী ঠেকাও, তাতে লাভ বেশি। সুতরাং বিজেপি-র সঙ্গ ছাড়তে হবেই। বহুদিন ধরেই একটা জম্পেশ সুযোগের অপেক্ষায় থেকে থেকে অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আলিমুদ্দিন স্ট্রীট আর রাইটার্স বিল্ডিং এর ভুলে বেশ কিছুটা মাইলেজ অযাচিত ভাবে এসে গেল। ব্যাস আর যায় কোথা! ধরতে বিন্দুমাত্র দেরী করেননি বিরোধী নেত্রী। যার জন্য তাকে একদা কংগ্রেস ছেড়ে ফাঁসির নাটক করতে করতে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল সেই সোমেন মিত্রকেও পেয়ে গেলেন সঙ্গী হিসাবে। বেচারা সোমেন এই অবেলায় কোথায় আর যাবেন বন্ধু খুঁজতে। তাই একরকম লাথি ঝাঁটা খেয়েও বঞ্চনার শোধ তুলতে মমতারই আঁচল ধরলেন। মমতার ফুর্তি আর ধরে না। শুরু হল তার স্বপ্নের

মায়াজাল বোনা। লক্ষ্য তার অর্জুনের পাখির চোখ — রাইটার্সের গদী দখল। কিন্তু মমতা বুঝতে পারছেন না ভোটটা হয়ে গেলে যে রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরী হবে তাতে তার বহুলালিত পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে দেরি হবে না। কারণ নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে কে কোন ভূমিকা নেবে তা আঁচ করা তাঁর কর্ম নয়। মমতাকে যারা চেনেন তারা জানেন তার দলে তিনিই শেষ কথা। যারা একদিন প্রথম দিন থেকেই তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই অজিত পাঁজা, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি দশা হয়েছিল সকলেরই জানা। মাধবী মুখার্জী কিংবা কৃষ্ণা বসুর কি হাল সকলেই জানেন। পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় তো রাজনীতি থেকে একেবারে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য হলেন। মালা রায়, নির্বেদ রায়, অরুণাভ ঘোষদের কি হাল করে ছেড়েছেন তা কারও অজানা নেই। যার ডান্ডার ঘায়ে বহুদিন চিৎপাত হয়েছিলেন সেই বাদশা আলমকে ও বহুদিন তাঁর পেছনে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে। জ্যোতিবাবুর মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালেই তিনি রাইটার্সে হেনস্থা হয়েছিলেন। সেই জ্যোতি বাবু এখন তার কাছে মনীষী। আর যারা একদিন শত বায়নাক্কা সহ্য করেও তাকে তুলে ধরেছিল, ভালবেসেছিল তারা এখন তার শত্রু তালিকায়। সেই পুরানো প্রবচন সত্যি হলো — 'নীচ শ্লাঘ্য পদং প্রাপ্য স্বামীনং হন্তুমিচ্ছতি।'

ভোটের পরে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তার সংঘাত লাগবেই বিভিন্ন ইস্যুতে। তখন সনিয়া গান্ধীর গলার কাঁটা হয়ে যাবেন তৃণমূল নেত্রী। তখন সনিয়াও তাকে ছেঁটে ফেলতে রেয়াত করবেন না। কংগ্রেস তাকে গিলে খাবার চেষ্টা চালাবেই। চাণক্য প্রণব মুখার্জী কখনই তাকে আসল কংগ্রেস-এর মর্যাদা দেবেন না। আর যারা হাইকমান্ডের ভ্রূকুটির ভয়ে একজোট হয়েছেন সুযোগ পেলেই তারা আবার খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন সন্দেহ নেই। আর সোমেন মিত্র সবে সুচ হয়ে ঢুকেছেন, যেদিন ফাল হয়ে বেরোবেন সেদিন আমও যাবে ছালাও যাবে। তাই মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দ্বিচারিতা আজ পরীক্ষিত। তার অবস্থা এখন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর মতো রঙিন চশমা পরে স্বপ্ন দেখছেন — আয় বাদী তুই বেগম হবি খোয়াব দেখেছি।

পরম্পরা

রাজা যুবনাশ্ব

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সঙ্কটে পড়লেন রাজা যুবনাশ্ব। এ যে হিতে বিপরীত। এক আশায় তপোবনবাসী হয়েছিলেন। আশা পূরণের সোনালি আলোও দেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, ভগবান এবার কৃপা করবেন তাঁকে। তিনি হবেন পুত্রের জনক। দূর হবে অপুত্রক হওয়ার দুঃখ, বেদনা। কিন্তু —

ভাবতে পারেন না রাজা যুবনাশ্ব। ধিক্কার দেন তিনি নিজেকেই। কেননা এই সঙ্কট যে ডেকে এনেছেন তিনিই। তিনি যদি ওই মন্ত্রপূত পুংসবন কলসের জল পান না করতেন, তাহলে তো এমন অঘটন ঘটতো না। দুর্ভাগ্য তাঁর। এবার বুঝি তীরে এসে ডুবল তরী। পুত্র তো হলই না, উল্টে নিজেরই প্রাণসঙ্কট। কী করবেন বুঝতে পারেন না রাজা। বুঝতে পারেন না বলেই, আবার শরণ নেন সেই ভগবানেরই।

ঋষিরাও তাঁকে বলেছেন সেকথাই। এই সঙ্কটে ঈশ্বরের করুণাই উদ্ধারের একমাত্র পথ। তাই কাতর হয়ে ডাকতে থাকেন ঈশ্বরকেই।

রাজা যুবনাশ্ব ঈশ্বরকে ডাকছেন। আর ভাবছেন, সত্যিই মানুষের জীবনে সব সঙ্কট, সব সমস্যা, সব অশান্তির মূলেই রয়েছে পিপাসা। অর্থের পিপাসা, ক্ষমতার পিপাসা, সব কিছু একা ভোগ করার পিপাসাই মানুষের সব সুখ-শান্তি হরণ করে। দিনরাত্রি পিপাসার দহনে জ্বলে মানুষ হারায় শান্তিকে। ডেকে আনে একের পর এক বিপদকে।

বারবারই রাজা ভাবেন, গভীর রাতে তিনি পিপাসার্ত হয়েছিলেন সত্য। নিদারুণ পিপাসায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হাতের কাছে জল না পেয়ে চলে এসেছিলেন যজ্ঞশালায়। এসেই দেখলেন যজ্ঞবেদীর ওপর জলভর্তি পুংসবন কলসটি। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিপাসা যেন বেড়ে গেল কয়েক হাজার গুণ। হারিয়ে গেল সব বিচারবোধ। ঋষিদের অনুমতি না নিয়ে যে ওই কলসি ধরা উচিত নয়, এই বোধও হারিয়ে গেল তাঁর। তিনি আকণ্ঠ পান করলেন ওই কলসির জল।

রাজা তিনি। ঈক্ষ্বাকুর বংশধর। অযোধ্যার সিংহাসনে বসেছেন তিনি পিতা প্রসেনজিতের পর। অবিনয়ী তিনি নন। অজ্ঞ জ্ঞানহীন অপণ্ডিতও নন। নীতিজ্ঞান বর্জিতও নন। তিনি জানেন, না বলে অপরের জিনিস নেওয়াটা চুরি। এই ধরনের চুরির জন্য তিনি অনেককে দিয়েছেন কঠোর শাস্তিও। অথচ, এই মুহূর্তে তিনি সেই নীতিহীন কাজটিই করলেন। ডেকে আনলেন নিজের সর্বনাশ!

সর্বনাশ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাবে। পুরুষ হয়ে কেমন করে গর্ভধান করবেন তিনি? কেমন করে জন্ম দেবেন সন্তানের? বাঁচবে তো সন্তান? বাঁচবেন তিনি নিজে? — এখনই সব ভাবনার অস্থির যুবনাশ্ব একমনে ডাকতেও পারেন না ঈশ্বরকে। তারপর একসময়, 'সবই ভবিতব্য' ভেবে শান্ত হয়ে ডাকতে থাকেন বিপদত্তারণ শ্রীমধুসূদনকে।

প্রসেনজিৎ আর গৌরী দেবীর ছেলে রাজা যুবনাশ্ব। পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবেই তিনি বসেছিলেন অযোধ্যার সিংহাসেন। তারপরই ওই ভয়ঙ্কর চিন্তাটি অস্থির করে তুলল তাঁকে। এরপর? এরপর কী হবে? কে বসবে সিংহাসনে? উত্তর পান না রাজা। অবশেষে একদিন রাজ্য শাসনের ভার মন্ত্রীদের দিয়ে তিনি চলে আসেন ঋষিদের আশ্রমে। তাঁদের

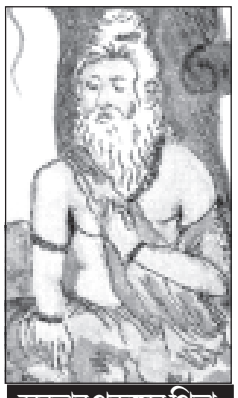

অবতার পুরুষের পিতা

অনুমতি ও নির্দেশ অনুযায়ী ডাকতে থাকেন ঈশ্বরকে।

সন্তানহীনতার জন্য রাজ্য ত্যাগ করে তাঁদের আশ্রমে চলে আসার দুঃখ পেয়েছিলেন ঋষিরা। করুণায় ভরে উঠছিল তাঁদের মন। আশ্বাস দিয়েছিলেন, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন তাঁরা। সেই যজ্ঞের ফলেই গর্ভবতী হবেন রাজমহিষী।

কথামতো ঋষিরা শুরু করেছিলেন ইন্দ্রদৈবত যজ্ঞ, রাজা ব্রতধারী হয়ে বাস করছিলেন তখন সেখানেই। সারাদিন যজ্ঞ শেষে পুংসবন করতে কলস ভরে ঋষিরা সে কলস রেখেছিলেন যজ্ঞবেদীতে। পরদিন সকালে এই পুংসবন বারি পান করলেই রাজমহিষী জন্ম দেবেন সন্তানের। যেভাবে যজ্ঞ শেষ হয়েছে তাতে খুশি ঋষিবৃন্দ। সেই আনন্দেই ক্লান্ত ঋষিরা ঘুমিয়ে ছিলেন গভীর ঘুমে।

ঘুমিয়ে ছিলেন রাজাও। গভীর রাতে নিদারুণ পিপাসায় ভেঙে যায় ঘুম। জল দেবার জন্য ডাকেন তিনি, কই কেউ আদৌ আমাকে একটু জল দাও। কেউ সাড়া দেয়নি রাজার ডাকে। পিপাসায় আর্ত রাজা তখন নিজেই জলের খোঁজে ছাড়েন শয্যা। খুঁজতে খুঁজতে চলে আসেন যজ্ঞশালায়। দেখেন যজ্ঞবেদীর ওপর রাখা কলসটিকে।

কলসটি দেখলেও প্রথমেই কিন্তু পান করার জন্য সেই কলসটি তুলে নেননি। তিনি ডেকেছিলেন ঋষিদের। কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ঋষিদের ঘুম ভাঙেনি। আর ডাকতে ইচ্ছে হয়নি রাজা যুবনাশ্বেরও। বরং এক ধরনের করুণায় ভরে উঠেছিল তাঁর মন। আহা! সারাদিন কত না পরিশ্রম করে যজ্ঞ করেছেন তাঁরা। তাঁরই জন্য। তাঁরই মঙ্গল কামনায় — তাঁরই সন্তান লাভের পথ করে দেবার জন্য। পরিশ্রান্ত ঋষিদের তাই ঘুম ভাঙাতে সায় দেয়নি মন। তাছাড়া ওই তো কলসে রয়েছে জল। ওই জলটুকু তিনি নিজেই নিয়ে পান করতে পারবেন। এরজন্য ঋষিদের ঘুম ভাঙানো উচিত নয় — ভেবেই তিনি কলসটি তুলে নিয়েছিলেন। তারপর কলসের সবটুকু জল পান করে পরম তৃপ্তিতে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ছিলেন নিজের শয্যায়।

পরদিন সকালে যজ্ঞশালায় শূন্য কলসি দেখে হায়, হায় করে ওঠেন ঋষিরা। কে যেন এই মন্ত্রঃপূত জল পান করেছে। ওই জল যে তাঁরা রেখেছিলেন যুবনাশ্ব মহিষীর জন্য। ওই জল পান করলেই যে পুত্রবতী হতেন তিনি।

ঋষিদের ডাকে যজ্ঞশালায় আসেন রাজা। সব শুনে দাঁড়িয়ে থাকেন মাথা নীচু করে। করুণকণ্ঠে বলেন, দোষী তিনি, পিপাসায় অধীর হয়ে তিনিই পান করেছেন ওই কলসির জল। আর্তকণ্ঠে বলেন ঋষিরা, করেছেন কী? মন্ত্রপূত অব্যর্থ ওই জল । এ জল যে পান করবে, তাকেই যে ধারণ করতে হবে গর্ভ।

কিন্তু পুরুষ হয়ে আমি কেমন করে গর্ভধারণ করবো? কেমন করে জন্ম দেব সন্তানের?

ঋষিরা বলেন, এসবই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। তিনি নিজেই আসছেন। তারই জন্য এই লীলা। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি শুধু সংযত চিত্তে ডাকুন ভগবানকে। আর আমরা ব্যবস্থা করছি সন্তানের নিরাপদ জন্মের।

তাঁদের কথা মতোই রাজা ডাকেন ভগবানকে। আর ঋষিরা করে যান ঈশ্বরের আরাধনা। তারপর যথাসময়ে রাজার কুক্ষিভেদ করে জন্ম নেয় সূর্যসম এক তেজস্বী পুত্র। জন্মেই স্তন্যপানের জন্য কাঁদতে থাকে শিশু। তার সেই কান্না শুনে, যে ইন্দ্রদৈবত যজ্ঞর ফলে জন্ম এই সন্তানের সেই যজ্ঞের অধিপতি ইন্দ্র স্বয়ং আবির্ভূত হন। নবজাতকের মুখে নিজের তর্জনটি দিয়ে তিনি বলেন, মাম্ ধাস্যতি — এটি চোষ তুমি।

তাই করল শিশু। আর তাতে একদিনেই সে পরিণত হয় পূর্ণবয়স্ক যুবায়। ইন্দ্রের ওই 'মাম ধাস্যতি' কথাটির জন্য নবজাতকের নাম হয় 'মান্ধাতা' — তার থেকে মান্ধাতা।

মান্ধাতার কাছে আপনা থেকেই আসে বেদ, আসে আজগা ধনুক, শৃঙ্খ উদ্ভব-বাণ এবং অভেদ কবচ। জন্ম মাত্রই সুশিক্ষিত পূর্ণ বয়স্ক অবতারপুরুষ পুত্র পেয়ে দূর হল রাজার বিষয়বাসনা। মান্ধাতাকে অভিষিক্ত করলেন তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে। সে অভিষেক সম্পন্ন করলেন স্বয়ং ইন্দ্র।

তারপর, সব কিছু ছেড়ে নির্বাসনা রাজা যুবনাশ্ব চলে যান তপোবনে। সেখানেই ভগবান হরির গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করেন রাজা। পান পরমাগতি। আর অবতার পুরুষ মান্ধাতা হন ধর্মরক্ষক। দুষ্কৃতীদের ত্রাসের কারণ। নাম হয় তাঁর ত্রাসদস্যু। সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়ে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন ধর্মকে।

ঈশ্বর পুরুষের রঙ্গরস

বৈদেহীনন্দন রায়

ঈশ্বর হাসেন। হাসেন সাযুজ্য প্রাপ্ত ঈশ্বর পু(ষরা। ঈশ্বরের মুচকি হাসি আসে যখন দুজনে একফালি জমিতে দড়ি ধরে বলেন, এটা আমার ওটা তোমার। তখন একবার। চিকিৎসক যখন রোগীর আত্মীয়দের অভয় দিয়ে বলেন — ভয় কি, আমি তো আছি। তখন দ্বিতীয়বার। দেশনেতা যখন আমজনতার সামনে প্রবল প্রত্যয়ের সাথে প্রতিশ্রুতির বারিবর্ষণ করে বলেন — তোমাদের সব দুঃখ-দূর্দশা দূর করে দেশে সমৃদ্ধির বন্যা বইয়ে দেব। তখন আর একবার।

ঈশ্বর পু(ষরা হাসেন অবশ্য মোহগ্রস্ত মানুষের মূঢ়তা, কান্ডজ্ঞানের দৈন্য দেখে। সচেতন করেন আপন সহজবোধ্য ে(ষাত্মক হাস্যরসে। যে হাস্যরসে থাকে প্রজ্ঞার গাম্ভীর্য, সত্যের দীপ্তি আর জীবনের বাস্তবতা। তাঁদের রঙ্গরস বা কৌতুক মোহগ্রস্ত মানুষের মানসিক ক্লৈবত্ব মোচনে। জীবনের প্রকৃত সত্য তাঁদের কাছে প্রস্ফুটিত হয় ঐশী প্রজ্ঞার আলোকে। বিষয়াসক্ত(মানবমনকে তাঁরা জাগ্রত করেন পরিহাসের প্রদর্শনে। ঈশ্বরপু(ষদের সেই রঙ্গরসিকতা নিয়ে এই প্রতিবেদন,

মহাযোগী রামদাস কাঠিয়া বাবা

একবার রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের অন্তরঙ্গ শিষ্য তারাকিশোর চৌধুরী (পরবর্তীকালে সন্তদাস কাঠিয়া বাবা) কলকাতায় জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের প্রাবল্য বাড়তে মনে হল তাঁর গুরুমহারাজজী অর্থাৎ কাঠিয়া বাবাজী তো সর্বদা গাঁজা খান।

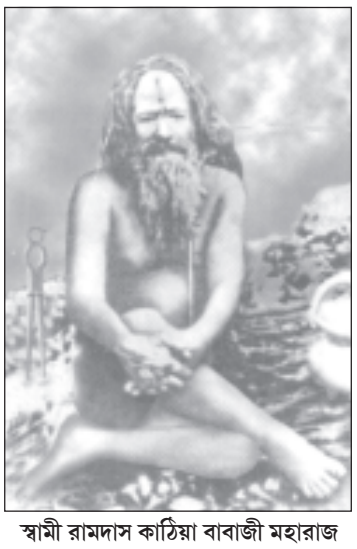

স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

সুতরাং তাঁকে এক ছিলিম গাঁজা ভোগ দিয়ে যদি গ্রহণ করা যায়, তাহলে জ্বরের নিরাময় হতে পারে। তাই করলেন। গুরুদেবের (কাঠিয়াবাবা) চিত্রপটের সামনে গাঁজা ভোগ দিলেন ও প্রসাদ স্বরূপ সেই গাঁজার কলকেতে কয়েকবার টান দিলেন। তাতে সত্যই জ্বরের উপশম হল।

কয়েক মাস পর তারাকিশোর বৃন্দাবনে দাবানলকুন্ডে কাঠিয়া বাবাজীর দর্শনে এলেন। বাবাজী তখন কয়েকজন ব্রজবাসীকে নিয়ে গাঁজা সেবন করছেন। বাবাজীকে ওই অবস্থায় দেখে তারাকিশোর আশ্রমে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তারাকিশোরের ডাক পড়ল বাবাজীর সাথে দেখা করার জন্য। তিনি যেতেই বাবাজী তাঁর হাতে প্রসাদী গাঁজা দিয়ে বললেন — এই গাঁজা পান কর।

সে সময় এক ব্রজবাসী বাবাজীকে জিজ্ঞাসা — বাবুসাব কি গাঁজা খান? বাবাজী স্মিত হাস্যে কৌতুকের সুরে বললেন — না, খায় না বটে। তবে জ্বর হলে কখনও কখনও আমাকে নিবেদন করে গ্রহণ করে।

একবার কাঠিয়া বাবাজীকে সন্তদাসজী প্রশ্ন করেন — এত নেশা করেন, এতে তো ক্ষতি হতে পারে। কাঠিয়া বাবাজী শুনে বললেন — বাবা, জিস পর ভগওয়ান কা অমল চড় গিয়া উসপর অওর কোই অমল কভি চড়তা নেহী। অর্থাৎ যাঁর সর্বসত্তায় ভগবানের নেশা চড়ে আছে, সংসারে কোনও নেশাই তাঁর ওপর ভর করতে পারে না।

জ্ঞ সূত্র ঃ শ্রীশ্রী ১০৮ রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবন চরিতব

অত্যাধুনিক যুগের প্রলোভন এড়িয়ে কেন সন্ন্যাস জীবন !

ইন্দিরা রায়

অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিতা লাবণ্যময়ী কন্যার মাত্র ১৭ বছর ১ মাস ১ দিন বয়সে স্বচ্ছল পরিবারে বিবাহ দেন বাবা-মা। সংসারী হয়ে স্বামী ও দু'পুত্র নিয়ে ভালই কাটছিল দিন। কিন্তু মনটা বাঁধা পড়ত না — সংসারের ঘেরাটোপে। তাই তো

গুরু শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রবণ তীর্থ গোস্বামীর সান্নিধ্যে মাতাজী

বহুগুণসম্পন্না কৃষ্ণা রায় সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিজেকে যুক্ত করেন। কবিতা লেখা, চিত্রনাট্য রচনায় ছিলেন দক্ষ। এই জগতে তিনি পরিচিত নাম। কবিতা রচনার জন্য ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেশ ও বিভিন্ন জায়গার সংস্থা থেকে একুশটি পুরস্কার অর্জন করেন। এরই পাশাপাশি ছিল আধ্যাত্মিক চেতনা। মাত্র ন'বছর বয়সে ঈশ্বরীয় ধারায় দীক্ষিত হন জন্মসিদ্ধ শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর কাছে সংসারী কৃষ্ণা রায়। আধ্যাত্মিক পরিবেশে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। মামা, বড় দাদামশাই-এর মধ্যে আধ্যাত্মিক মানসিকতা ছিল। বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর সঙ্গে ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক। সেই প্রভাবেই ছোট্ট কৃষ্ণা শৈশব থেকেই দেবতাকে ভালবাসতে শেখে, এমনকী সাত বছর বয়সে গোপাল কুড়িয়ে পেয়ে সযত্নে সিংহাসনে স্থাপন করে।

নাবালক দু'পুত্রকে নিয়ে অল্পবয়সে স্বামীহারা হন। সম্পত্তির আশায় কোনও সাংসারিক জটিলতায় না গিয়ে, নিজের চেষ্টায় উপার্জনের পথে যান। সেই সঙ্গে ছেলেদের বড় করে তোলেন। আবর্তিত জীবনের আবর্ত ঘুরপাকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরীয় উপলব্ধি অর্জন করার পর, গৌড়ীয়ধারায় দীক্ষিত হন — বিষ্ণুপদ ১০৮ ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি প্রবণ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-এর কাছে। কৃষ্ণা রায়ের জীবনে আসে বিরাট পরিবর্তন ১৯৯৭-এ। তিনি হয়ে ওঠেন 'কনক মঞ্জুরী' মাতাজী।

স্বাধীনচেতা ভক্তিপ্রাণা কৃষ্ণাদেবী নিজের অর্থে, সংসারে থেকে সমাজ সেবা ও আধ্যাত্মিক পথে তো এগিয়ে যেতে পারতেন, তিনি পরমবৈষ্ণব হলেন কেন? এই প্রশ্ন তাঁর কাছে তুলে ধরলে তিনি সপ্রতিভ ও বলিষ্ঠভাবে জানান — আমি ছোট থেকেই মনে করেছি যদি দেবতা ও মানুষকে একভাবে সমান্তরালভাবে ভালবাসতে পারি, তবে আমি একটা পথ দিয়ে যেতে পারি। সেবা করার মনোভাব ছোট থেকেই ছিল। আমার কাছে 'মানুষ' বড়, 'ধর্ম' বড় নয়। ভক্তি ও প্রেম যেখানে, সেখানে কোনও ভেদাভেদ নেই। ঈশ্বরের সকল জীবকেই ভালবাসি। পশু পাখি এমনকী প্রকৃতির রাজ্যে ফুল ফল, গাছপালাকেও। কারণ, সবই আমার বিধাতার সৃষ্টি। ভগবত প্রেম হল অন্য প্রেম — স্নিগ্ধতা। যে প্রেম পোড়ায় না। তিনি সর্বভূতে বিরাজমান।

সবসময়ে মনে নানা প্রশ্ন ভিড় করতো। কতটা অন্যের দেশকে আপন মাটি ও অন্যের ছেলেকে আত্মজ করতে পারব, যাতে গর্ভজাত ও হৃদয়জাতর মধ্যে কোনও ভেদ থাকবে না। সেই কাজটা করার জন্যই দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে চেষ্টা করে চলেছি। দশটা বছর সময় লেগেছে শুধুমাত্র নিজেকে বুঝতে, জানতে। ১৯৯৭-র ২২ জানুয়ারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঠাকুরপুকুর থেকে বজবজের কাছে শামালি গ্রামে কিছু জমি কিনি। সেখানে টালির ঘর করে অনাদরের শিশুদের জন্য 'দেবশিশু ভবন' আবাসন তৈরি করি। শিশুদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার দায়িত্ব নিই। নিজস্ব অর্থে একাজ করি। প্রথম শুরু হয় চারজন শিশুকে নিয়ে — যার মধ্যে ছিল তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে। এখন ষোলজন। একটা সোসাইটি গড়ে তুলি। ৯৭-তে রেজিস্ট্রি হয়। এর নাম 'কলাকীর্তি' যার শব্দগত অর্থ — 'কলা'— ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষ, 'কীর্তি' যে কর্ম ঈশ্বরকে নিবেদন। পরে বৃদ্ধাদের জন্যও একটা আশ্রয়স্থল করি, যেখানে তাঁরা নতুন আলো দেখতে পারবেন। এই সংস্থায় মেডিকেল ইউনিট মাসে একদিন বসে। বিনা পয়সায় ডাক্তাররা দেখেন এবং ওষুধ দেন। শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা নয়, পশ্চিমবাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে একই ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক কাজ হয়। ওড়িশার গ্রামে গুরুপীঠ আছে।

সমাজসেবার তাগিদেই দিল্লীতে সরকারি সোশাল ওয়েলফেয়ার প্রজেক্ট অফিসার হিসেবে দীর্ঘ পাঁচবছর কাজ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে দূর-দূরান্তের

অঙ্গনা

গ্রামগুলিতে সেখানকার মানুষ, গাছপালার সঙ্গে পরিচিত হন। ওনার কাছে ধর্ম মানে শুধু আনুষ্ঠানিক পুজো, জপতপ নয়, ধর্ম মানে মানুষের সেবা, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গা ঘুরেছেন। পৃথিবীর বহু মানুষ তাঁর কাছে এসেছেন। তাদের সঙ্গে তিনি নানা ধরনের জীবকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছেন। সব কিছুর মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন — পৃথিবীতে অনেকেই জীবকল্যাণে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ওনার মনে হয়েছে সংমিশ্রণের মধ্যে যে আলো সেটা পেরেছেন, একমাত্র শ্রীমন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, জীবের মধ্যে প্রেম প্রীতির রামধনু আঁকতে।

ঠাকুরপুকুরের প্রত্যন্ত শামলা গ্রামে 'দেবশিশু ভবন'-এর একাংশ।

সোসাইটির ব্যয়ভার কীভাবে হয় — প্রশ্নের উত্তরে বলেন : সোসাইটিতে অর্ধেক টাকাই ঈশ্বরের কৃপায় অর্জিত অর্থ এবং এখনও অবসরের প্রাপ্য অর্থ ব্যয় হয়। সোসাইটির কোর কমিটির বৃহদাংশ দান তো আছেই, পাঁচজনের সেবাও আছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের অনুদান রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্মিলিতভাবে শান্তি স্থাপনের জন্য 'সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল' গড়ে তোলে — যার স্লোগান — 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'। আমি আজীবন সদস্য হিসেবে যুক্ত। এদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ে মনের প্রসারতা সমৃদ্ধ হয়। ২০০৩-এর জুলাই মাসে পৃথিবীর চৌদ্দটি দেশ থেকে ১৮ থেকে ২২ বছরের মহিলারা 'ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ' মিট করেন শান্তিনিকেতনে। দেশগুলি ছিল — ফ্রান্স, স্পেন, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, লন্ডন, ইউ এস এ, জর্মান, সুইডেন, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জাপান (বুদ্ধিস্ট)। সেইসব দেশের মহিলাদের সঙ্গে আন্তরিক মেলবন্ধন অক্ষুণ্ণ আছে।

মানবসেবামূলক কাজকর্ম দেখে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই সত্য শিব সুন্দরকে পাওয়া যায় — এই তথ্যে বিশ্বাসী মাতাজী। উনি মুক্ত মানুষ। তাই কোনও মঠ বা আশ্রমের অনুশাসনে বদ্ধ হতে চাননি। কৃষ্ণের পূজা করে মানুষকে ভালবেসেই তাঁর আনন্দ। বর্তমানে বাঘাযতীন এলাকায় কুসুমকাননে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মন্দির-এর প্রভুর কৃপায় স্থান পেয়েছেন। প্রভুর সেবায় এই মন্দির প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছে। মন্দিরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাতাজী। আগে থেকেই নিয়মিত পাঠ, ভোগ হত। কিন্তু উনি কমিটি ও সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে সেবা উৎসব চালু করেছেন। ভবিষ্যতে অতিথিশালা নাটমন্দির করবার পরিকল্পনা আছে। প্রভুই নিয়ে এসেছেন তাঁকে — স্বীকারোক্তি মায়ের।

আপনার সেবামূলক কাজের ভবিষ্যত কি — উত্তরে জানান, ভবিষ্যত-এ কী করব এখনও ভাবিনি। সে তো প্রভুর ইচ্ছা। তবে, একটা স্থায়ী আবাসন শিশু ও বৃদ্ধাদের জন্য করে দেবার ইচ্ছা। ঠাকুরপুকুরের পাঁচবিঘা জমিতে হাসপাতাল গড়ার পরিকল্পনা আছে, বিশেষত মায়েদের জন্য। আমাদের সমাজে মায়েরা বড়ই অবহেলিত। সবশেষে বলতে হয়, আমার ইচ্ছার ওপরে আছেন প্রভু। এই যে সংসারে বাস করছি — তা তো পরমার্থের ঘর। অর্থ সব দিতে পারে না — কিন্তু পরমার্থ লাভ হলে আর কিছুই চাই না।

'কলাকীর্তি'র ব্যানারে আশ্রমে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের একাংশ।

রোমানীয় প্রতিশোধ

(৯ পাতার পর)

উচিত ছিল সহানুভূতি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এরাই দুর্বল কংগ্রেস নেতৃত্বের জন্য। এখনও হিন্দু সমাজের এক বৃহৎ অংশ প্রতারিত। এই হিন্দুত্ব শক্তি দেশজুড়ে বারোটি প্রদেশে দক্ষতার সঙ্গে শাসন চালাচ্ছে। এই শক্তি নেতৃত্ব দিচ্ছে কুড়িটি ভিন্ন মতাদর্শের দলকে এবং এদের এক স্বয়ংসেবক লালকেল্লা থেকে ছ'বার পতাকা উত্তোলন করেছেন। স্বাধীনতা দিবসে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইনিই বিশ্বনেতাদের এবং মিডিয়াকে প্রভাবিত করেছেন। দেশের পরিকাঠামোসহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেকর্ড উন্নয়ণ ঘটিয়েছেন। দেশের নারীশক্তিকে উৎসাহিত করেছেন, দেশের এক মুসলিমকে সংবিধানের উচ্চতম পদে বসিয়েছেন এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার চোখে ধূলো দিয়ে পোখরানে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। তা বিশ্বের চোখ রাঙানি এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে। তবুও বলা হয়, এরা উন্নয়ণবিরোধী, নারী বিরোধী ও অসামাজিক। দেশের প্রধান প্রধান প্রচার মাধ্যমগুলি এদের মতাদর্শকে ঠিকমতো প্রচার করে না, প্রতিটি সংবাদ এরা বিকৃত করে প্রচার করে। কুৎসা রটায়, তা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ প্রচার মাধ্যমে এরাই প্রধান মুখ।

এইসব ব্যক্তিদের উন্নয়ণ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আনুগত্য এতটাই প্রবল যে, এরা হিন্দুদের বিশ্বাসে আঘাত হানতে লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো রামসেতু ড্রেজার দিয়ে ভেঙে দিতে পিছপা হয় না। এতে যদি সামুদ্রিক প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায় তা এরা পরোয়া করে না। কিন্তু বিপরীত ক্রমে এরাই জাতীয় সড়কে বে-আইনিভাবে গড়ে ওঠা দরগা ভেঙে দিতে ভয় পায়। কারণ এতে ভোট ব্যাঙ্কের ক্ষতি।

এরপরও এরা প্রচার চালায়, এরাই জাতির ভবিষ্যৎ!

ঠাকুরনগরে মতুয়া মেলায় সমাজ সেবা ভারতীর সেবাকাজ

সংবাদদাতা।। সমাজসেবা ভারতী, বনগাঁ মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে গত ২৪-২৫ ও ২৬ মার্চ উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগরে মতুয়া মহামেলায় যাত্রীদের

সহায়তা করার উদ্দেশ্যে একটি জলসত্র ও প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। জামদানী বিবেকানন্দ শাখার স্বয়ংসেবকরা বিপুল উৎসাহে এই সেবাকাজে অংশগ্রহণ করে। প্রদীপ জ্বালিয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন স্থানীয় খণ্ড কার্যবাহ প্রণয় ঘোষের মাতৃদেবী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বনগাঁ মহাকুমা প্রচারক হরনাথ দে, বিস্তারক সোমনাথ ঘোষ, শ্রীমতী শাশ্বতী নাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিন হাজার লোককে জল, বাতাসা, ভিজে ছোলা দেওয়া হয়। এই শিবিরে ওষুধপত্র দিয়ে সহায়তা করেন প্রণয় ঘোষ। শিবিরে সহায়তা করেন রুমা রায়, হিরণ্য রায়, শাশ্বতী নাথ, অন্নপূর্ণা নাথ। এছাড়া আরও বেশ কিছু মহিলা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির তরফ থেকে সাহায্য করতে উপস্থিত ছিলেন।

মহিষাদলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাসন্তী পূজা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহিষাদল শাখা কেন্দ্রে গত ১ এপ্রিল থেকে চারদিন ধরে শ্রীশ্রী বাসন্তী দেবীর পূজা মহোৎসব ও হিন্দু ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ স্বামী বিভাসানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী ধ্যানেশানন্দজী মহারাজের পরিচালিত ও চারণ দল এবং সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখার সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ সেখানে সমবেত হন। মহাসপ্তমীর বিকালে আত্মরক্ষামূলক লাঠি, ছোরা খেলা ও যোগাসন প্রদর্শনের পর অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলন। সম্মেলনে ভারতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা সভা হয়।

সভাপতিত্ব করেন অনিরুদ্ধ জানা (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গেঁওখালী হাইস্কুল)। উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী অরূপানন্দজী মহারাজ (অধ্যক্ষ নাটশাল রামকৃষ্ণ আশ্রম) এবং প্রধান বক্তা পরমেশ আচার্য (অধ্যাপক, তমলুক মহাবিদ্যালয়)। মাতৃপূজা, শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজা ও অন্নকূট উৎসবের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সমাবেশ সমাচার

বলাগড়ে রামনবমী উৎসব

গত ৩ এপ্রিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বলাগড় প্রখন্ডের পরিচালনায় সারাদিন ব্যাপী রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'জয়রাম শ্রীরাম" সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিভিন্ন সাধু-মহাত্মা এবং অন্যান্য বক্তা শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শের কথা তুলে ধরেন।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার বৌদ্ধিক প্রমুখ সুকান্ত মজুমদারের বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধ দেব মন্ডলের হাতে সমাজের সেবার জন্য সুকান্ত মজুমদারের মা শ্রীমতি নিবেদিতা মজুমদার নগদ ৫০০১ টাকা মঙ্গলনিধি হিসাবে প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভাগ সহ ব্যবস্থা প্রমুখ প্রদীপ কুমার সাহা, জেলা সহ-কার্যবাহ উদয়- শঙ্কর সরকার, জেলা সেবা প্রমুখ অমিয় মাহাতো এবং প্রদেশের বালক প্রমুখ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়চৌধুরী।

ধর্মরক্ষা মঞ্চে র সন্তযাত্রা

সংবাদদাতা।। ধর্মরক্ষা মঞ্চ দক্ষিণ-বঙ্গের ৬টি স্থান থেকে ৬টি সন্তযাত্রার আয়োজন করে। এই উপলক্ষে দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলার প্রতিটি খন্ডে বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়। বাদ ছিল না মহানগর কলকাতাও। গত ২২ মার্চ হাওড়া জেলা থেকে সন্তযাত্রার শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন মঞ্চে র প্রান্তীয় সহ-সংযোজক স্বামী শিব চৈতন্য মহারাজ ও স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ। ২৭ মার্চ মেদিনীপুরের খড়্গপুর থেকে সন্তযাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী রামানুজ পরাশর, স্বামী ভবানন্দজী, ঋতানন্দজী মহারাজ। পুরুলিয়া জেলাতেও সন্তযাত্রা হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, স্বামী গোবিন্দজী মহারাজ। বীরভূমের দেবীর সাধনপীঠ তারাপীঠ থেকে মঞ্চে র সন্ত যাত্রা বের হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বামী হংসানন্দজী, স্বামী তেজসানন্দজী, স্বামী মুদ্রগিরি মহারাজ ও স্বামী হরিহরানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুর নিমতলা থেকে যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন স্বামী নরেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহারাজ ও স্বামী ভক্তিজীবন জনার্দন মহারাজ। সাগর

জেলার (দঃ ২৪ পরগণা) নামখানা থেকেও যাত্রা বের হয়। এর মধ্যে কলকাতা মহানগরের অনুষ্ঠানগুলি ছিল আকর্ষণীয়। গত ২৮ মার্চ পূর্ব কলকাতায় রামায়ণ পাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠানসহ একাধিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন কোচবিহারের মানবসেবা মন্দিরের স্বামী গণেশানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও ২৯ ও ৩১ মার্চ দক্ষিণ কলকাতা ও উত্তর কলকাতায় মঞ্চে র পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওইসব ধর্মীয় সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও সাধু-সন্তরা। গত ৩১ মার্চ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বলাগড় প্রখন্ডের পরিচালনায় তিনটি স্থানে "সন্তযাত্রার" কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ডুমুরদহ উত্তম আশ্রম, তারপরে কোলড়া অরুণাশ্রম প্রাঙ্গণে এবং সর্বশেষে মশড়া তারা মায়ের মন্দিরে। প্রত্যেক জায়গায় সাধু মহারাজগণ হিন্দু সমাজের উপর অত্যাচার অনাচার এবং আক্রমণের বিষয়ে জনগণকে সতর্ক করেন। তারা মা মন্দিরে অনুষ্ঠানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

মজবুত নেতা, নির্ণায়ক সরকার

(১০ পাতার পর)

বজায় রাখতে হলে পাকিস্থানী সন্ত্রাসবাদীদের চূর্ণ করতে হলে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দিকে দিকে বি জে পি প্রার্থীদের জয়ী করুন। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) এবং কংগ্রেস ও তৃণমূল সুবিধাবাদী জোটের বিরুদ্ধে বি জে পি প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন। কারণ সি পি এম-এর বছরের অপশাসন, কুশাসন, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী দলের অপসারণ এবং কংগ্রেস ও তৃণমূলের সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বি জে পি প্রার্থীদের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জয়ী করুন।

বি জে পি একমাত্র নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক দল যাদের মজবুত নেতা আছে এবং যারা নির্ণায়ক সরকার চালাতে পারে। অকংগ্রেসী, অ-বিজেপি তৃতীয় ফ্রন্ট যার নায়ক সি পি আই (এম), হালে পানি না পেয়ে এখন মায়াবতী, জয়ললিতা, চন্দ্রবাবু নাইডুর মতো দুর্নীতিগ্রস্ত ও চরম সুবিধাবাদী নেতা-নেত্রীদের নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার স্বপ্ন দেখছে। যা আসলে কাল্পনিক ও অবাস্তব কারণ এদের কোনও নীতি নেই। সকলেই প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন। যাদের কোনও কর্মসূচী নেই, কোনও মতাদর্শ নেই, তারা আবার সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখবে — যা একেবারেই হাস্যকর।

বিজেপি বা কংগ্রেস (ই) দলের সাহায্য ছাড়া কেন্দ্রে কোনও সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। এন ডি এ সরকার আবার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হবে।

বরুণ গান্ধীর বিপক্ষে কেন?

(১০ পাতার পর)

কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করলেন আর সেটা সমর্থন করলেন মমতাজ বানু। সিঙ্গুরের ধর্নামঞ্চে মুসলিম মহিলাদের মতো মাথা এবং চুল ঢেকে নামাজ আদায় করেন কাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আর কিসের ধান্দায়? মুসলিম ভোট কব্জা করার ধান্দা না পেট্রোডলারের স্রোত অব্যাহত রাখার ধান্দা? তিনি কি জানেন না ভারত আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরীর সাহায্যকারী কনৌজ রাজ জয়চন্দ্রের পরিণতি? বাংলার সুলতান হোসেন শাহর মন্ত্রী রূপ এবং সনাতনের অবস্থা বা বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রর করুণ পরিণতি? তাহলে? সব জেনে বুঝেও এরা এদেশের মুসলমানদের তৈল মর্দন করে চলেছেন সামান্য কিছু লাভের আশায় আর সমগ্র দেশকে ঠেলে দিচ্ছেন এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে। বরণ গান্ধীর বিরুদ্ধে এন এস এ প্রয়োগ করে এটাওয়া জেলে রাখা হয়েছে। বিজেপি রাজনাথ সিং জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। জানিয়েছেন শিবসেনা প্রবীণ বাল থ্যাকারে বরুণ গান্ধীর স্বপক্ষে কথা বলেছেন। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কি জানেন না, বোঝেন না, ভারতের মুসলমানদের এক বিরাট অংশের সমর্থন এবং সাহায্য না থাকলে বহিরাগত মুসলমান সন্ত্রাসীরা এদেশে এত ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারত না। এই সমস্ত স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশকে কাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন একবারও চিন্তা করে দেখেছেন কি? সম্ভবত, না। মাংসের দোকানের সামনে বেঁধে রাখা ছাগলগুলো যেমন সামনে রাখা কাঁঠালপাতাগুলোই দেখতে পায়, একটু দূরে তাদের জন্য কি পরিণতি অপেক্ষা করছে দেখতে পায় না, এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেইরকমভাবে শুধু পেট্রোডলার আর মুসলিম ভোটই দেখতে পায় — ভবিষ্যতের করুণ পরিণতির কথা আর মনে থাকে না। তাই মুসলমানদের স্বপক্ষে ওকালতি করার লোকের অভাব এদেশে না হলেও ১১০ কোটি মানুষের (?) দেশে বরুণ গান্ধীর স্বপক্ষে কথা বলার লোক এদেশে খুব বেশি নেই।

আসলে সাতশো বছর মুসলমানের আর দুশো বছর ইংরেজের শাসনাধীনে থেকে ভারতবাসী পরিণত হয়েছে মেরুদন্ডহীন এক ক্লীব জাতিতে, অপরের দাসত্ব আর মনোরঞ্জন করাই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আর বিনোদন।

মূকাভিনয়ের কর্মশালা কলকাতায়

।। দীপেন ভাদুড়ি।।

মানুষ শব্দের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে। শব্দ ব্যতীত অঙ্গভঙ্গি, চোখের অভিব্যক্তি দিয়েও মনের ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেরকম নাচের মুদ্রা, চোখের মুদ্রা, এগুলোর মাধ্যমেও অপরের সঙ্গে কথোপকথন চালানো যায়।

রঙ্গম

মানুষের এইসব প্রকাশ মাধ্যম থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মূকাভিনয়। মূকাভিনয় শিল্পের প্রসার পৃথিবী জুড়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আমাদের ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে বহু পূর্ব থেকে এই মূকাভিনয়ের চর্চা চলেছে।

পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামীর পরিচালনায় সম্প্রতি মূকদের নিয়ে এ ধরণের কর্মশালা ১০ দিন যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে সল্ট লেকের ই জেড সি সি-তে।

উদ্যোক্তারা দাবি করলেন এ ধরনের মূকাভিনয়ের কর্মশালা অর্থাৎ মূকদের নিয়ে কলকাতায় এ রকম কর্মশালা আগে অনুষ্ঠিত হয়নি। এই কর্মশালায় সকল শিক্ষার্থীরা ছিল মূক সম্প্রদায়। মূক-রা আজ আর অবহেলিত নয়। তারাও স্বাভাবিক মানুষের মতো সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, এ বোধ তাদের ভিতর জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয় এই কর্মশালার মাধ্যমে।

সহ সঞ্চালক চঞ্চল রায় জানালেন, মূক শিক্ষার্থীদের এখানে শিক্ষাদানের মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথকে সুগম করা হয়েছে। এবং তারা ভবিষ্যতে মূকাভিনয়ের শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন অতিবাহিত করতে পারে সে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এই কর্মশালায়।

এই কর্মশালার মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ সুগম করা হচ্ছে।

আসানসোল থেকে কল্পতরু গুহ এই কর্মশালা পরিচালনায় সহায়তা করেছেন। তিনি মূকাভিনয়ে দুবার রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পদক লাভ করেছেন।

এই প্রতিবেদক কর্মশালায় বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত করেন এবং তিনি দেখেন সুশৃঙ্খল ভাবে শিক্ষার্থীরা অপেক্ষা করছে। তারা আন্তরিক ভাবে শিক্ষালাভ করার চেষ্টা করছে।

কর্মশালায় মূকাভিনয়।

ভূপালের অরুণ সাকসেনা শিক্ষার্থীদের মূকাভিনয়ের কৌশল হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন।

আদিত্য মিত্র রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের প্রধান। তিনি নৃত্যের উপযোগিতা এবং নৃত্যের মুদ্রার তালিম দিচ্ছেন। নৃত্যের সূক্ষ্ম মুদ্রা তাদের হাতে ধরে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই মুদ্রা মূকাভিনয়ের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা।

সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী এবং গৌতম মিত্র লোকধর্মীয় অভিনয় শিখিয়েছেন।

মুখোশের প্রয়োজনীয়তা এবং তৈরি করার কলাকৌশল শিখিয়েছেন সোমনাথ মজুমদার।

যোগাসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা — এসব রয়েছে এই কর্মশালার শিক্ষাক্রমে। মূকাভিনয়ে সাজসজ্জার গুরুত্ব অনেক। সাজসজ্জা বিভাগে ছিলেন চঞ্চল দাসগুপ্ত। দেহ ভঙ্গিমা শিখিয়েছেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী রীণা জানা।

দশদিনের এই কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়েছে মাংসপেশীর শিথিলতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গের অভিব্যক্তি, তাল, লয়, ছন্দও। তাদের শেখানো হয়েছে কোনটা অব্যক্ত এবং কোনটা ব্যক্ত।

শেষদিনে সকল শিক্ষার্থীরা মূকাভিনয় প্রদর্শন করে সকলের প্রশংসা অর্জনে সফল হয়।

শব্দরূপ - ৫০৫

অনুসূয়া মিত্র

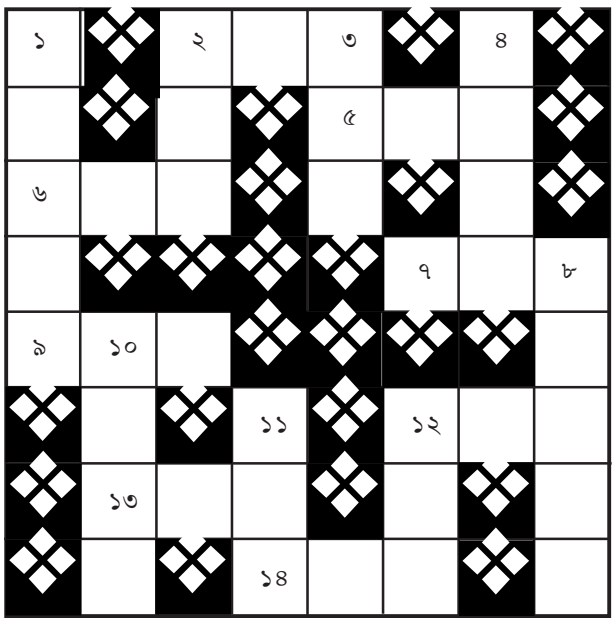

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. "— হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যাঁরে রবীন্দ্র সঙ্গীত, শেষ দুয়ে যন্ত্র, ৫. তৎসম শব্দে স্বর্ণকার, স্যাকরা, প্রথম দুয়ে রম্ভা, ৬. স্নেহ সম্বোধনে বাছা, গো-শিশু, ৭. গতকালের আগের দিন, প্রথম দুয়ে আপন নয়, ৯. এই ঘাসের নল দিয়ে কলম তৈরি হয়, শেষ দুয়ে মোটা থান ধুতি বিশেষ, ১২. জলজ এক শাকবিশেষ, ১৩. বায়ুর দেবতা, ১৪. আরাধনা, ব্রত, আগাগোড়া সৌরভ তনয়া।

উপর-নীচ ঃ ১. শ্রীকৃষ্ণ, শেষ দুয়ে বন্ধু, ২. রসাল, রসযুক্ত, ৩. হিন্দি শব্দে কাঠ, ৪. বিশেষণে যে খোদাইয়ের কাজ করে, ৮. দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত অসুর ভ্রাতৃদ্বয়, ১০. গণেশ, শেষ দুয়ে স্বামী, ১১. সর্পমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ১২. প্রতিশব্দে সদাশয়, মনস্বী, সদাত্মা।

সমাধান শব্দরূপ ৫০৩

সঠিক উত্তরদাতা

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌণক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭

ভা	র	ত	ল	ক্ষ্মী	■	■	চি
স্ক	■	■	খা	■	প	ত	ত্র
র	মা	■	ই	লা	■	■	সে
■	র্ক	■	■	স	না	ত	ন
দ	ণ্ড	ধ	র	■	■	ক্ষ	■
ধি	■	■	ব	সা	■	ক	চ
ক	ম	লা	■	হি	■	■	তু
র্ম	■	■	স	ত্য	সু	ন্দ	র

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ৪ মে ২০০৯ সংখ্যায়।

হিংসা দূর হটো 'খোয়াব' নাটকের বক্তব্য

দীপেন ভাদুড়ি।। নিপীড়িত মানুষ আজ অহিংসা অবলম্বন করে বাঁচার চেষ্টা করছে। বর্তমান পৃথিবী হিংসার সংঘাতে বিপন্ন। বিপন্ন মানুষের বিবেক, ভদ্রতা, সভ্যতা সর্বোপরি মানুষের অস্তিত্ব। নতুন পৃথিবী চায় না সংঘাত, চায় না সন্ত্রাসবাদ। যে কোনও উন্নয়ণের শর্ত তো রক্তপাত হতে পারে না। হিংসার মাধ্যমে মানব সমাজের উন্নয়ণ করা যায় না, একথা আজ প্রমাণিত। "খোয়াব" নাটকের নির্যাসে এ কথা বলা হয়েছে।

গান্ধীজী এবং মার্কস-এর জীবন দর্শনের মধ্যে আদর্শজনিতসম্পর্কের এই অন্বেষণই হল খোয়াব নাটকের বিষয় বস্তু।

নাট্যকার / নির্দেশক আশিস চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, অন্তিমে একটা ভাবনা আছে। সেটা "খোয়াব" কিনা বিচারের ভার আপনাদের।"

শ্রেণী শত্রুরা ধীরে ধীরে গরীবকে বাস্তুচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই সুদূর অতীত কাল থেকে। যুগে যুগে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার লোকের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাদের সংগ্রামের ফলে এখনও গরীব তার বাস্তুতে বসবাস করছে।

তথাকথিত সামাজিক নেতা প্রধানের চক্রান্তে জনজাতিরা বাস্তুচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনায় পাভেল রুখে দাঁড়ায়। সংলাপে বলা হয়, "আদিবাসীদের সঙ্গে কয়েক হাজার পাখিও বাস্তুচ্যুত হবে"। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে প্রকৃতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নাট্যকারের সে ভাবনার সঙ্গে দর্শকও একমত।

নাটকে দেখানো হয়েছে শিশু শ্রমিকদের কাজের মাধ্যমে দক্ষ করার ছলনা। শিশু শ্রমিকদের শ্রম আরও বেশি করে আদায়ের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

পাভেল শিশু শ্রমিকদের উদ্ধারে এবং জনজাতিদের স্বার্থে লড়াই করে যাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে গ্রামবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু শোষক গোষ্ঠী সেই পাভেলকে দালাল এর তকমা লাগিয়ে দিতে চাইছে। সেই আদি ও অকৃত্রিম খেলা। সমাজের স্বার্থে ভালো কাজ করার প্রচেষ্টাকে দমিয়ে দেওয়া, ব্যর্থ করার অপচেষ্টা। তাকে পঙ্গু করে দেওয়া যেন প্রতিবাদীরা কখনও মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, অত্যাচারিতরা যেন সমাজের অনুন্নত শ্রেণীকে শোষণ করে যেতে পারে।

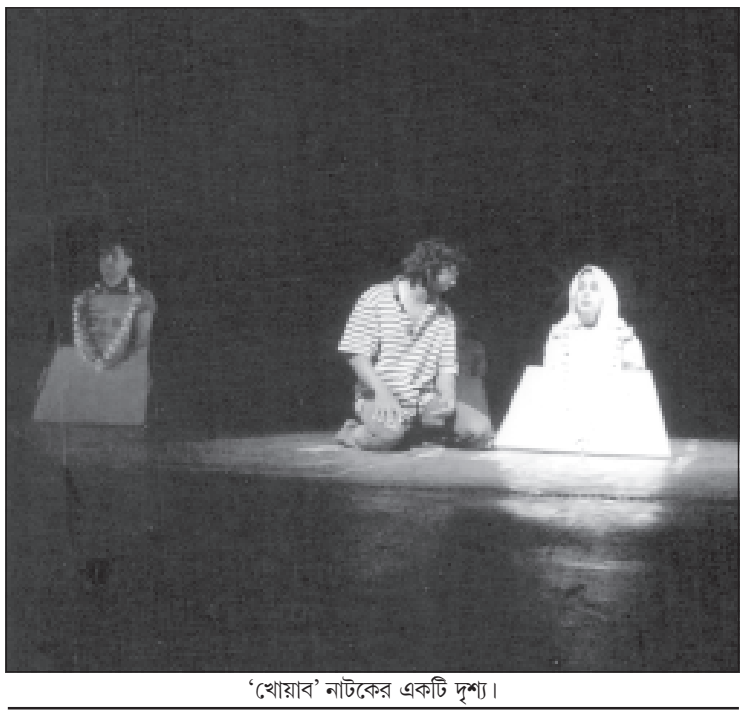

'খোয়াব' নাটকের একটি দৃশ্য।

"শিল্পায়ন" নাট্য গোষ্ঠী অহিংসার লাঠি নিয়ে অজানা সফর করে চলেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, তাদের "খোয়াব" নাটক নিয়ে।

গত ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল এই নাটকটি। উদ্যোক্তারা দাবি করলেন এটি তাদের ৪৯ তম অভিনয়। দর্শকদের অভিমত এ নাটক তাদের মর্মে আঘাত করেছে। এবং এ নাটক ছড়িয়ে যাক দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে।

পাভেলের চরিত্রে শৌভিক সরকার - এর অভিনয় এ নাটকের সম্পদ। দর্শক তার সাবলীল অভিনয়ের গুণে নাটক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারবেন না। সরমার চরিত্রে দীপা ব্রহ্ম। রামবাবুর চরিত্রে সুজিত দাস, রোপধনীর চরিত্রে তাপস দত্ত চৌধুরী, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে অভীক বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ।

নির্দেশক আশিস চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থাপনার গুণে নাটকটি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। মঞ্চ -অভীক সরকার, আবহ-স্বপন ব্যানার্জী, আলো-রাজু ভট্টাচার্য নাটকের প্রত্যাশা পূরণে সফল।

রাজস্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রাজস্থান পরিষদের সভায় 'স্মরণিকা' উন্মোচন করছেন রাজস্থানী মাসিক 'মাণক' পত্রিকার সম্পাদক পদ্ম মেহতা। মঞ্চে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) যুগল কিশোর জৈথলিয়া, বিশ্বম্ভর নেবর, সরিতা যোশী, পদ্ম মেহতা, দীনেশ বজাজ, অরুণ মল্লাবত, শার্দূল সিংহ, নন্দলাল শাহ ও পরশুরাম মুন্দ্রা।

বঙ্গভঙ্গ-র ধুয়ো তুলেছে সি পি এম

(১ পাতার পর)

করেনি বামফ্রন্ট সরকার। আপেল, কমলালেবুর মতো ফলচাষের সমূহ সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি পর্যটন শিল্পেও চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ মাত্রারিক্ত হয়ে যাওয়ায় হোটেল মালিকদের নিত্য নতুন বঞ্চ নার শিকার হন কর্মীরা। পর্যটক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও নজর দেননি সরকার। পাহাড়ে জলকষ্ট কোনও নতুন ঘটনা নয়। সিঞ্চ ল লেকের অপরিস্কার জলে অসুস্থ হয়ে যান পর্যটকরাও। পাহাড়বাসীর এই বিপুল ক্ষোভকে চাপা দিতেই নিজের তাগিদে সিপিএমের মন্ত্রী শিলিগুড়ির কার্যত মাফিয়া অশোক ভট্টাচার্যের পরামর্শে তৈরি হল এক পাহাড়ি ব্যক্তিত্ব। নাম সুবাস ঘিসিং। তাঁর মেকী আন্দোলনের চাপে তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 'গোর্খাল্যান্ড' নামক খুড়োর কলকে সামনে ঝুলিয়ে পাহাড়কে নিয়ে এলেন ষষ্ঠ তফসিলের আওতায়। তৈরি হল DGHC (Darjeeling Gorkha Hill Council)। কিন্তু পাহাড়ের সবাই তো তফসিল জাতি-উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়! তাই স্বায়ত্তশাসন পাবার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল পাহাড়বাসীর। মানুষের এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া ক্ষোভ আঁচ করেই গত লোকসভা নির্বাচনে আচমকাই ভোটের ৭দিন আগে কংগ্রেস প্রার্থী দাওয়া নরবুলাকে সমর্থন করে তাকে জিতিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বের অধিকারী হন ঘিসিং। কিন্তু ভবি ভোলাবার নয়। ঘিসিং-এর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে গোর্খাল্যান্ড-এর দাবিকে সামনে রেখে উঠে এলেন বিমল গুরুং আর তার সহযোগীরা। এতে প্রমাদ গুণল সি পি এম। 'আমরা বাঙ্গালী' নাম দিয়ে সি পি এমের হার্মাদবাহিনী আক্রমণ করল শিলিগুড়ির নেপালীদের। গড়ে তুলল পাহাড় ও সমতলের রক্তাক্ত বিভেদ।

গোর্খাল্যান্ড নিয়ে ঠিক কি বলেছেন বিমল গুরুং দেখে নেওয়া যাক। গুরুং বলেছেন, "Article 3A of the Indian Constitution we are demanding a separate state within Indian Territory. The area consisting of Derjeeling, Duarse and adjacent Area. This is the demand of Gorkha Janmukti Morcha."-এ বিষয়ে বিজেপির প্রত্যুত্তর , "Our thinking, We will sympathitically examine their demand and provide appropriate justice." গুরুংদের দাবি আর বিজেপির আশ্বাস সবই কিন্তু ভারতীয় সংবিধান, ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আশ্রয় করেই। তাই নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে বামফ্রন্ট সরকার যে 'বঙ্গ ভঙ্গে'র ধুয়ো তুলছে তা শুধু অযৌক্তিকই নয়, এতে দেশের সংবিধানকে অসম্মান করা হচ্ছে। বিজেপি বিশ্বাস করে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদে, যেখানে বলা হয় কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী, গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত সকল বসবাসকারী ভারত মায়ের সন্তান। সুতরাং বিজেপির মতাদর্শে দেশ বিভাজনের কোনও স্থান নেই। কিন্তু দেশকে সুশাসনের অধিকারী করার লক্ষ্যে ছোট ছোট রাজ্য গঠন করে সেখানে স্বায়ত্তশাসন জারি ও স্বনির্ভর করে তোলার মধ্যে বিজেপির জাতীয়তাবাদী আদর্শ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ২১ চৈত্র (ইং ০৪ এপ্রিল, ২০০৯) প্রকাশিত একটি সম্ভাবনা শীর্ষক সম্পাদকীয়টি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সম্পাদকীয়টির শেষাংশ এখানে হুবহু উল্লিখিত হচ্ছে। "এখানে অন্য, বৃহত্তর একটি প্রশ্নও আছে। বিজেপি একটি জাতীয়তাবাদী দল, যে দল বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দেয় না। উপরন্তু জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উপরেই জোর দেয়। তাহার জাতীয়তার ধারণা লইয়া প্রশ্ন থাকিতে পারে। কিন্তু এমন একটি দল যদি একটি প্রান্তীয় ভৌগোলিক এলাকায় জনজাতীয় আত্মশাসনের দাবির প্রতি সহমর্মী হয়, তবে তাহা আর যাহাই হোক বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিবে না। ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্রীয়তা অনুশীলন করিতে সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ , তাহাতে আঞ্চ লিক, প্রাদেশিক বা খন্ডজাতীয় আত্মশাসন কিংবা নিদেনপক্ষে দর কষাকষির ক্ষমতা অর্জনের অভিপ্রায়কে বিচ্ছিন্নতাবাদ আখ্যা দেওয়া মূঢ়তা। অথচ প্রায়শ আঞ্চ লিক দল অঞ্চ লের উপর নিজ আধিপত্য অটুট রাখার কায়েমি স্বার্থে এই স্বশাসনের আকাঙ্ক্ষাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ রূপে সনাক্ত করিয়া দমননীতি চালাইয়া থাকে। গোর্খাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল একটি জাতীয় দল যদি তাঁহাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতে টানিয়া আনিতে পারে, তাঁহাদের পরিষদীয় গণতন্ত্রের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারে, তবে সেটাই শ্রেয়। সুবিবেচনাসম্পন্ন বঙ্গবাসী অতএব দার্জিলিংয়ের পরীক্ষাগারটির দিকে সাগ্রহে তাকাইয়া থাকিবেন।"

ছোট ছোট রাজ্য যে দেশের উন্নয়নে সহায়ক তা বিহার ভেঙ্গে ঝাড়খন্ড এবং মধ্যপ্রদেশ ভেঙ্গে ছত্তিশগড় হবার পর সফলভাবে প্রমাণিত। আসলে ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের কোনও জাত নেই। এদের উৎসভূমি রাশিয়া। চীনের আশ্রয়ে লালিত ও পালিত হয়েছে গত ছ'দশক ধরে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে অন্তর্ঘাত করে, পাকিস্তান-এর দাবি যাদের কাছে ছিল 'Progressive Demand', ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর যাঁরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে তেলেঙ্গানা আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি মেরেছিলেন, যাদের প্রশ্রয়ে '৪৭ এ বঙ্গদেশের অঙ্গচ্ছেদ এবং দেশবিভাজন হয়েছিল এবং যারা এখনও অরুণাচল প্রদেশের একাংশকে চীনকে দিতে আগ্রহী তাদের মুখে এই বঙ্গবিভাজনের বেদনা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণেরই সামিল।

কিন্তু কংগ্রেস তো একটি জাতীয়তাবাদী দল। ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের কিছু অবদানও রয়েছে। তবে তাদের মুখে এই বঙ্গ ভঙ্গের বেদনা কেন? একি শুধুই ভৌগোলিক জাতীয়তার আদর্শগত নাকি রাজনীতির ক্ষমতায়ন এতই মোহগ্রস্ত করে ফেলেছে যে ন্যূনতম চেতনাও হয়ত তাদের লুপ্ত হয়েছে।

আসলে বঙ্গাধীপ সিপিএম বিজেপির উত্থানে আতঙ্কিত। মুখে আন্তর্জাতিকতা আর মুখোশের অন্তরালে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উগ্র প্রাদেশিকতা দেশের সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক সিপিএম পার্টির জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অশান্ত পরিবেশের সুযোগ নিয়ে এদেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলকে রক্তাক্ত করতে তারা ব্যগ্র। তাই পরাজয় নিশ্চিত জেনেই তাদের মুখে বঙ্গভঙ্গে-র এই কুম্ভীরাশ্রু।

টাইটলার-দের ক্লিন চিট দিল সি বি আই

(১ পাতার পর)

নানাবতী কমিশনের রিপোর্টে তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে টাইটলার ও সজ্জন কুমারকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য দিল্লীর তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, পি জি গাভাই এবং পুলিশ কমিশনার, এস সি ট্যান্ডনকে দায়ি করা হয়। টানা দু'দিন দাঙ্গা চললেও এই দুই প্রধান প্রশাসনিক কর্তা ঘুমিয়ে ছিলেন। সান্ধ্য আইন বা কারফ্যু জারি করা হয়। কিন্তু তা অমান্য করে দাঙ্গাকারীরা হত্যা, লুঠ, অগ্নিসংযোগ চালিয়ে ছিল। পুলিশ বাধা দেয় নি। সামরিক বাহিনীকে তলব করা নিয়ে গভর্নর অযথা কালক্ষেপ করেন। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে উপর মহলের নির্দেশেই টাইটলার ও সজ্জন কুমারকে আড়াল করতে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট করে দেওয়া হয়।

নানাবতী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বিজেপি অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে মনমোহন সিংহ সরকার মামলার পুনর্বিচার শুরু করতে আদালতে যায়। আদালতের নির্দেশে সি বি আই তদন্ত শুরু হয়। এই তদন্তেই সি বি আই জগদীশ টাইটলারকে নিরপরাধ ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে আনা মামলা খারিজ করার জন্য আদালতে সুপারিশ করেছে। সি বি আইয়ের সুপারিশ মানা অথবা না মানা এখন আদালতের উপর নির্ভর করছে।

সুভাষ ছাড়া পাবেন কেন?

(১ পাতার পর)

আই পি এস অফিসার অশোক সাহু বলেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে সরকার। বিজেপি প্রার্থী অশোক সাহু লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর খুনীদের অবিলম্বে জেলে পোরার দাবি করেছিলেন। ওড়িশার জনজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলিতে চার্চ যেভাবে ধর্মান্তরকরণ করছে তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এবং হিন্দুদের এককাট্টা হতে আবেদন জানিয়েছেন। আর তাতেই চটেছেন নবীন পট্টনায়ক। অশোক সাহুকে জেলে পোরার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বরুণ-অশোক সাহুদের জন্য এক বিচার, আর সোনিয়া-সুভাষদের জন্য অন্য?

হিম্মৎ দেখানো দরকার

(১ পাতার পর)

রাজনীতির বিষয় নয়, বরং রাজনীতির উর্ধ্বে। তবে হিন্দুর স্বার্থ র(া করতে পারে এমন সরকার গঠিত হোক, এটা আমরা চাই। এজন্য হিন্দু সমাজকে সচেতন হতে হবে। হিন্দু সমাজ নিজেদের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে জানুন, এজন্য তাদের সচেতন করা দরকার।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা ভোট ব্যাঙ্ক তৈরিতে হিন্দুরা বি(াস করে না। কিন্তু হিন্দু ভাবাবেগের প্রভাব রাজনীতিতে প্রতিফলিত হোক এটা চায়। রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার না হওয়ার জন্য হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার ঠিক নয়। আর এজন্য নির্বাচনের সময় হিন্দুদের হিম্মৎ দেখানো দরকার।

শ্রীযোশীর আরও বক্ত(ব্য, যেভাবে দেশের রাজনীতি আঞ্চলিকতা নির্ভর হয়ে পড়ছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধির জন্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বিপন্ন হতে পারে। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলিরই কেন্দ্রে শক্তি(শালী হওয়া দরকার।

Swastika
20 April - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

উন্নতশির দুই তরুণের স্বপ্ন ঃ রাহুল চক্রবর্তী ও ব্রতীন সেনগুপ্ত

।। অর্ণব নাগ ।।

কেন্দ্র ঃ উলুবেড়িয়া

'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।'

কেন্দ্রের নাম উলুবেড়িয়া। হাওড়া জেলার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা কেন্দ্র। বিশেষ করে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাম্প্রদায়িক বদান্যতায় বাংলার আধুনিক সন্ত্রাসবাদের উৎস হিসেবে কেন্দ্রটির নামডাক হয়েছে

রাহুল চক্রবর্তী
কেন্দ্র ঃ উলুবেড়িয়া

সম্প্রতি! কেন্দ্রটিতে হিন্দু ভোটার ৭৩ শতাংশ ও মুসলিম ভোটার ২৭ শতাংশ। এখানে প্রার্থীপদ মোটামুটি চারজনের চূড়ান্ত আপাতত। তাঁরা হলেন বামফ্রন্ট প্রার্থী সি পি এমের হান্নান মোল্লা, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের জোট প্রার্থী সুলতান আমেদ, পি ডি সি আই-এর নবাব আমেদ এবং মুসলিম ভোটের তাগিদে তিন মুসলিম প্রার্থীর মাঝে সবেধন নীলমণি প্রার্থী বিজেপির রাহুল চক্রবর্তী। কেন্দ্রটির রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সাংঘাতিক। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও বেশ পেছিয়ে রয়েছে উলুবেড়িয়া কেন্দ্র। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা ইতিমধ্যেই ছেয়ে গেছে গোটা কেন্দ্র জুড়ে। অপরাধমূলক কাজের সংখ্যা সেখানে দিনে দিনে বাড়ছে। স্থানীয় মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসবাদীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছে একমাস পূর্বে উলুবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত চেঙ্গাইলে। সেখানকার চপকাসি এলাকার বাবুস কোয়ার্টারে হামলা চালিয়ে মুসলিম দুষ্কৃতীরা পুড়িয়ে দেয় ৪০ জন হিন্দুর বাড়ি। ঘটনা রূপ নেয় ভয়ঙ্কর দাঙ্গায়। গত বছর পাঁচলার বুকেও প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু ভোট বড় বালাই! বিশেষ করে ওই বিপুল সংখ্যক মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক হারাতে চান না কোনও মুসলিম প্রার্থীই।

মুসলমানদের জন্য কোনও দল কি করেছে তার খতিয়ানই এবার মূল অ্যাজেন্ডা ওই প্রার্থীদের। চলছে প্রকাশ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি। কিন্তু তিনি অন্যরকম। রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুঁড়িতে তাঁর একদমই রুচি নেই। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মতো দেওয়াল লিখে বা অকারণে মাইক বাজিয়ে দৃশ্যদূষণ বা শব্দদূষণ কোনটাতেই তাঁর আগ্রহ নেই। শুধু নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার লক্ষ্যে রাজনৈতিক কচকচানির ঘোর বিরোধী তিনি। উলুবেড়িয়ায় একঘেয়ে ক্লিষ্ট হয়ে যাওয়া রাজনৈতিক ম্যানম্যানানির পরিবর্তে নতুন স্বপ্ন আমদানি করেছেন তিনি। সেই অনন্য, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবকটির নাম রাহুল চক্রবর্তী। উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, তাঁর আগমনে নতুন সূর্যের প্রতীক্ষায় উলুবেড়িয়া। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষের কাছে। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন চেঙ্গাইলের দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে। ধন ধান্য পুষ্পে ভরা, সন্ত্রাসবাদীমুক্ত মডেল লোকসভা কেন্দ্র উলুবেড়িয়া গড়ার লক্ষ্যে তিনি এখন বাসিন্দাদের নয়নের মণি।

সকাল ৮টায় চা-বিস্কুট খেয়ে শুরু হচ্ছে তাঁর রোজ-নামচা। দুপুর বারোটা পর্যন্ত অক্লান্ত প্রচারে পথে যা পাচ্ছেন মুড়ি, পাউরুটি তাই দিয়েই সারছেন জলযোগ। গরম থেকে বাঁচতে মাঝে মধ্যে চলছে গ্লুকোজের জল, ঠান্ডা লেবু জল। দুপুরের মেনুতেও খাবারের কোনও বাছ-বিচার নেই। কর্মীদের বাড়িতে, কর্মীদের সাথে যা পাচ্ছেন, তাই খাচ্ছেন, তবে পছন্দের খাবার অবশ্যই রাঢ় বাংলার চিরন্তন খাদ্য — ভাত, ডাল, পোস্ত। সেই সাথে একটা লঙ্কা আর লেবু হলে আর কিছুই চাই না তাঁর। রাত দশটায় প্রচার থেকে ফিরে এক গ্লাস দুধেই সারছেন নৈশাহার।

এক সাক্ষাৎকারে রাহুল চক্রবর্তী জানালেন, এই ঘুণ ধরা রাজনৈতিক পরিমন্ডল একেবারেই না পসন্দ তাঁর। নির্বাচনে নেমে ব্যক্তিগত কুৎসা, রক্তাক্ত হিংসা, দূষিত পরিবেশ ব্যথিত করছে তাঁকে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনী প্রার্থীরা কেবল আপন স্বার্থেই দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, মানুষের কথা ভাবার সময় নেই কারুর। সেই মানুষের কাছে পৌঁছে যেতেই ১৭ এপ্রিলের পর থেকে গ্রামে গ্রামে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত করবেন তিনি। সেখানে নটী বিনোদিনী ও অন্যান্য ধর্মীয় পালা দেখানো হবে। তাঁর কথায়, "যাত্রা হল একমাত্র আঙ্গিক, যার মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা ও নিবিড় সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন গড়ে তুলতে পারে। যেখানে বিদ্যুৎ নেই, বিনোদনের আর অন্য কোনও মাধ্যম নেই, সেখানে বাংলার সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিতেই আমার এই উদ্যোগ।" সব মিলিয়ে পৌরাণিক পালা দেখানোর পাশাপাশি তার শাশ্বত মূল্যবোধগুলিতে ভারতীয়ত্বেরই জয়গানে মুখরিত তাঁর নির্বাচনী প্রচার। তাঁর প্রথম পালাটি হবার কথা উলুবেড়িয়ার বাণীবনে। এছাড়াও লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আরো দুটি বিধানসভার প্রত্যেকটিতেই পালা দেখানোর ইচ্ছে আছে রাহুলবাবুর। নিজেই জানালেন এতে গ্রামের আট থেকে আশি সবার সাড়া ও উৎসাহ পাচ্ছেন বিপুলভাবে। এর সাথে আগামী পয়লা বৈশাখ রজনীকান্ত,

অতুলপ্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি ও রবীন্দ্রগানে সমৃদ্ধ এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উলুবেড়িয়াকে উপহার দেবেন তিনি। আসলে উলুবেড়িয়ার মানুষ রাহুল চক্রবর্তীর মধ্যে এমন একজন মানুষকে খুঁজে পেয়েছেন যাঁর সঙ্গে ভোটারদের সম্পর্ক শুধু নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ নেই। এই নির্বাচনী খেয়োখেয়ির মাঝে যিনি অক্লেশে বলতে পারেন, "যাকে খুশি ভোট দিন। কিন্তু ভোট দেবার সময় জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রাখবেন।" তবে এই অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টিগুলির মুসলিম তুষ্টিকরণের বহর দেখে শঙ্কিত রাহুল বাবু। তাঁর আশঙ্কা, "আমি হারলে উলুবেড়িয়াকে পাকিস্তান বানাবে ওরা।" আর জিতলে? তাঁর স্পষ্ট জবাব — 'গুজরাতের উন্নয়ণ মডেলকে সামনে রেখে সুশাসনের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাই আমার লক্ষ্য।" তাঁর আশু লক্ষ্য পূরণে ইতিমধ্যেই তৎপর উলুবেড়িয়াবাসী। গত ৩ এপ্রিল রাহুলবাবুর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মিছিল পা মিলিয়েছিলেন কয়েক হাজার লোক। এ সপ্তাহে নিজ উদ্যোগেই তাঁরা গো-হত্যা বিরোধী যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। আপামর বামবিরোধী মানুষ এখন রাহুলবাবুর পাশে। অঙ্গনওয়াড়ি, এন জি ও গড়ে তুলে, তাঁর যাত্রার আসরে স্থানীয় যাত্রা দলগুলিকে সুযোগ করে দিয়ে আগামী দিনে নবীন প্রজন্মের কর্মসংস্থানের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর নিজের কথা, "এই নির্বাচন আমার কাছে কোনও রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটা আমার আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই, হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, আগামী প্রজন্মের বাঁচার লড়াই।" সেই লড়াই-এ ৭৩ শতাংশ মানুষের সমর্থনেই তিনি এখন উলুবেড়িয়ার স্বপ্নের সওদাগর।

কেন্দ্র ঃ বারাসাত

"আমরা নতুন যৌবনেরই দূত"।

ছাত্র-যুবকদের কর্মসংস্থানের চিন্তা ব্যাকুল করে তুলেছে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ব্রতীন সেনগুপ্তকে। তিনি স্পষ্টই বলছেন, "মা-মাটি-মানুষ দিয়ে আর যাই হোক, কর্মসংস্থান হবে না।" এই অনুন্নয়নের রাজনীতিতে আখেরে যুবসমাজেরই ক্ষতি হচ্ছে বলে তাঁর ধারণা। শিল্প স্থাপন এবং শিল্পের প্রসার — এই নির্বাচনী অ্যাজেন্ডায় তিনি শহরাঞ্চলে তো বটেই, পৌঁছে যাচ্ছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গ্রাম ও শহর তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের এই দুই অংশেই মানুষের বিপুল সাড়া পাচ্ছেন তিনি। তাঁর প্রচার কৌশলে ইতিমধ্যেই ব্যাকফুটে ওই কেন্দ্রের অন্য দুই প্রার্থী ফরওয়ার্ড ব্লকের সুদিন চট্টোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বারাসাত কেন্দ্রের অন্তর্গত বাগুর, লেকটাউন অঞ্চলের ভি আই পি রোড দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়বে সৌম্য মুখের অধিকারী ব্রতীন সেনগুপ্ত, লালকৃষ্ণ আদবানীর ছবি সমৃদ্ধ ফ্লেক্সের হোর্ডিং। ওই রকম হোর্ডিং-এ ছেয়ে গেছে বিধাননগর সমেত ঐ লোকসভা কেন্দ্রের সর্বত্র। বারাসাত কেন্দ্রের প্রতিটি প্রান্তে ইতিমধ্যেই পৌঁছে যেতে পেরেছেন ব্রতীন বাবু। অন্য দুই প্রার্থী যেখানে একবার করে যেতেই হিমশিম খাচ্ছেন সেখানে বার দুই করে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। আর তাতেই তাঁর উপলব্ধি, "জেতা নিয়ে আমার কোনও সংশয় নেই। প্রশ্নটা হল কত ভোটে জিতব? মনে হচ্ছে লক্ষাধিক ভোটের মার্জিন থাকবে।" জিতলে কেন্দ্র হিসেবে কি পাবে বারাসাত? ব্রতীন সেনগুপ্ত-র অভিযোগ, "দীর্ঘদিন সংসদে অবহেলিত কেন্দ্র বারাসাত। আগেকার সাংসদরা কলকাতা পরবর্তী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেডকোয়ার্টার বারাসতের গুরুত্ব সংসদে সম্যকভাবে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন।" এবার নির্বাচনে জিতে সেই অবস্থা পাল্টাতে চান তিনি।

শুধু নিজের জয়ই নয়, নিজের দলের কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফেরা নিয়েও নিশ্চিত তিনি। সেই সামগ্রিক জয়ের রেশ থেকে আলাদা রাখতে চান না বারাসাতের মানুষকে। তাই বারাসাতের মানুষকে তিনি তাঁর প্রচারে বলছেন, "অনেক বেশী শক্তি নিয়ে এবার কেন্দ্রে আত্মপ্রকাশ করবে বিজেপি। তাই সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থিতিশীল সরকার গড়তে আমায় নির্বাচিত করুন।" এছাড়া সন্ত্রাস মোকাবিলায় ইউ পি এ সরকারের ব্যর্থতাকেও তিনি তাঁর প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার করেছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, ইউ পি এ বা বাম কেউই বিগত পাঁচ বছরে একবারও ভাবেনি যুবকদের কথা। তাঁর স্পষ্ট মত, 'আদবানীজীই দেশের সবচেয়ে যোগ্য নেতা।'

সকাল আটটাতেই ব্রতীনবাবু সেরে নিচ্ছেন দুপুরের আহার। ভাত-টাত খেয়েই রওনা হচ্ছেন প্রচারে। দুপুরবেলা আর

ব্রতীন সেনগুপ্ত
কেন্দ্র ঃ বারাসাত

খাওয়া-দাওয়ার কোনও ঝঞ্ঝাট রাখছেন না। সারা দিনে টুকটাক কিছু খেয়ে নিচ্ছেন। এই দাবদাহে কষ্ট হচ্ছে না? সহাস্যে বললেন তিনি, 'আমি দিল্লীর মানুষ। এই গরম সহ্য করার অভ্যেস আছে।' তবে বারাসাতের মানুষ নির্বাচনী উত্তাপ ভালই টের পাচ্ছে!

এমনিতে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরালো। ফরওয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবার এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছেন সিপিএম ঘেঁষা শিক্ষাবিদ সুদিন চট্টোপাধ্যায়কে। এ নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা নেতৃবৃন্দ। ব্লকের জেলা সম্পাদক সরল দেব ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, এমন সিদ্ধান্ত তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের দাবি ছিল নিখাদ ব্লক কর্মী হাবড়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চন্দন চক্রবর্তীকে প্রার্থী করতে হবে। কিন্তু সে দাবিতে কর্ণপাত করেনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সাধারণ ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের এও বলতে শোনা যায়, সুদিন চট্টোপাধ্যায় সিংহের পরিবর্তে কাস্তে হাতুড়ি তারা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেই বরং ভালো হত। তাই ওই কেন্দ্রে একরকম ভোট প্রচারে বিরত থাকছেন ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরা। ফলে বাধ্য হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের নাম করে ওখানে প্রচার চালাচ্ছে সিপিএমই। এছাড়া এবার ডিলিমিটেশনের ফলে বারাসাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিধাননগর। যে কেন্দ্রে গতবারও বিজেপি প্রার্থী তপন সিকদার বিপুল ভোটে এগিয়ে ছিলেন। তাই সব মিলিয়ে ওই বিক্ষুব্ধ ফরওয়ার্ড ব্লকের ভোট যদি বিজেপির দিকে সুইং করে তাহলে কিন্তু ব্রতীনবাবুর জয় নিশ্চিত।

এস এম এস, ই-মেলের মতো আধুনিক প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে এলাকার যুবক-যুবতীদের কাছে পৌঁছতে চাইছেন ব্রতীন সেনগুপ্ত। ভেবে রেখেছেন তাদের বিকল্প বিভিন্ন কর্ম-সংস্থানের ব্যাপারেও। আর এতেই মন জয় করে ফেলেছেন স্থানীয় যুব সমাজের। ব্রতীন বাবুর ডাকে এই যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে?

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com